শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজভাবনার দ্বিমাসিক

আশা-আমাদের বার্তা

মে-ডিসেম্বর ২০১৯

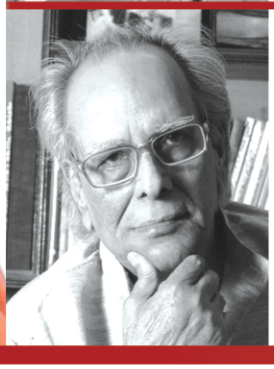

কৃতীদের হার্দিক অভিনন্দন

উচ্চ-মাধ্যমিক ২০১৯

সপ্তম

সাফিদা খাতুন
৪৮৯ (৯৭.৮%)

অষ্টম

কাজী ফাইয়াজ আহমেদ
৪৮৮ (৯৭.৬%)

১৪-তম

সেখ জিয়াউদ্দিন
৪৮২ (৯৬.৪%)

১৪-তম

সাহারিয়া তৃষা
৪৮২ (৯৬.৪%)

১৪-তম

সাহিল পারভেজ
৪৮২ (৯৬.৪%)

১৬-তম

সাফিউল ইসলাম
৪৮০ (৯৬%)

১৭-তম

মিরাজুর রহমান
৪৭৯ (৯৫.৮%)

১৭-তম

সোহেল রেজা
৪৭৯ (৯৫.৮%)

১৮-তম

আরসাদ আলি
৪৭৮ (৯৫.৬%)

১৮-তম

রুবেল মোল্লা
৪৭৮ (৯৫.৬%)

১৮-তম

মাসুদ মণ্ডল
৪৭৮ (৯৫.৬%)

১৯-তম

হালিমা পারভিন
৪৭৭ (৯৫.৪%)

১৯-তম

রাহিতুল আলম
৪৭৭ (৯৫.৪%)

১৯-তম

নিজামুদ্দিন মণ্ডল
৪৭৭ (৯৫.৪%)

২০-তম

সানা আজমি
৪৭৬ (৯৫.২%)

নুসরাতুল ফিরদৌস
৪৭৫ (৯৫%)

আনিসুর রহমান
৪৭৫ (৯৫%)

সেখ নিজাম আলি
৪৭৪ (৯৪.৮%)

সামিম আক্তার
৪৭৪ (৯৪.৮%)

জাহিদ হাসান
৪৭৪ (৯৪.৮%)

আতিক বিক্রম
৪৭৪ (৯৪.৮%)

পরীক্ষার্থী		৯০%	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬০%	সর্বোচ্চ
ছাত্র (বিজ্ঞান)	১১৩৭	১৮১	৪৫১	৭৬২	৯৬৯	১০৮৪	১১৩৬	৯৭.৬%
ছাত্রী (বিজ্ঞান)	৬৩৫	৩৯	১৪৬	৩২৯	৪৮৫	৫৮১	৬৩২	৯৭.৮%
ছাত্রী (কলা)	৩৩	১১	২৪	৩০	৩০	৩১	৩৩	৯৬.৪%
সর্বমোট	১৮০৫	২৩১	৬২১	১১২১	১৪৮৪	১৬৯৬	১৮০১	—

দুঃস্থ ও নিম্নবিত্ত পরিবার	৪৯৮ জন (২৮%)
নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার	৬৩৭ জন (৩৫%)
মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত	৬৭০ জন (৩৭%)

মাধ্যমিক ২০১৯

১৪-তম

সুমাইয়া খাতুন
৬৭৭ (৯৬.৭%)

১৫-তম

আশিক ইকবাল
৬৭৬ (৯৬.৬%)

১৮-তম

আফতাব মোল্লা
৬৭৩ (৯৬.১%)

২০-তম

আখতারা পারভিন
৬৭১ (৯৫.৯%)

সেলিম মণ্ডল
৬৬৯ (৯৫.৬%)

রহমত আলি
৬৬৯ (৯৫.৬%)

আজিম আরশাদ
৬৬৮ (৯৫.৪%)

নুরজামান সেখ
৬৬৫ (৯৫%)

পরীক্ষার্থী		৯০%	৮৫%	৮০%	৭৫%	৭০%	৬০%	সর্বোচ্চ
ছাত্র	১০৩৯	২৩৮	৫১৫	৭৪৫	৮৭৬	৯৪৯	১০০৪	৯৬.৬%
ছাত্রী	৪৬৮	৭২	১৮৩	২৭৬	৩৩৭	৩৮৩	৪৪২	৯৬.৭%
সর্বমোট	১৫০৭	৩১০	৬৯৮	১০২১	১২১৩	১৩৩২	১৪৪৬	—

দুঃস্থ ও নিম্নবিত্ত পরিবার	৪৩৯ জন (২৯%)
নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার	৬৭৬ জন (৪৫%)
মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত	৩৯২ জন (২৬%)

আল-আমীন বার্তা

বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ১৪২৬ । মে-ডিসেম্বর ২০১৯
রমজান ১৪৪০-রবিউস সানি ১৪৪১ ● নবম বর্ষ ● বিশেষ সংখ্যা

পরামর্শ পরিষদ
একরাম আলি সেখ মহম্মদ হাসান সেখ মারুফ আজম
এম আব্দুল হাসেম মাইনুদ্দিন আহমেদ

সম্পাদক
এম নুরুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
শেখ হাফিজুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী
দিলদার হোসেন একরামুল হক শেখ
আসাদুল ইসলাম সেলিম মল্লিক

জনসংযোগ
মহম্মদ আসরাফুল হোসেন মহম্মদ আলমগীর বিশ্বাস
সেখ মোমিনুর রহমান তসলিম আরিফ
সেখ মহম্মদ ইস্রাফিল মহম্মদ মহসীন আলি

ইন্টারনেট সংস্করণ
আব্দুল কাইয়ুম বিশ্বাস

বর্ণস্থাপন এবং গ্রাফিক্স
মহম্মদ গোলাম কিবরীয়া

আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম কর্তৃক প্লট নং ডি জে ৪/৯, অ্যাকশন এরিয়া ১, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং ডায়মন্ড আর্ট প্রেস ৩৭এ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯ থেকে মুদ্রিত।

মতামত এবং লেখা পাঠাবার ঠিকানা
নির্বাহী সম্পাদক, আল-আমীন বার্তা, ৫৩বি ইলিয়ট রোড,
কলকাতা ৭০০ ০১৬।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০ টাকা, সডাক ২০০ টাকা ● **প্রতি সংখ্যা** ২৫ টাকা

দূরভাষ ০৩৩-২২২৯ ৩৭৬৯, ৭৪৭৯০ ২০০৭৬
e-mail: alameenbarta@gmail.com
weblink: www.alameenmission.org
facebook.com/alameen.barta

মিশন সমাচার

সবাইকে তাক লাগিয়ে এ-বারও আল-আমীনের পড়ুয়ারা এনইইটি পরীক্ষায় আশাতিরিক্ত সফল। মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিকেও সাফল্যের ধারাবাহিকতা অটুট রেখেছে তারা। লিখেছেন **আসাদুল ইসলাম**

সেরা মেধাবীদের সেরা ঠিকানা

৬ পাতায়

অনন্য ব্যক্তিত্ব

পৃথিবীর সর্বোচ্চ সম্মান নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। দারিদ্র্য দূরীকরণে লাগাতার মৌলিক গবেষণা তাঁকে, তাঁর সহকর্মী ও স্ত্রী এস্থার দুফলো এবং মাইকেল ক্রেমারকে এনে দিয়েছে অর্থনীতিতে নোবেল। তাঁর অমূল্য কাজের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি। লিখেছেন **পল্লব সরকার**

চতুর্থ বাঙালি

১৯ পাতায়

সূ চি প ত্র

স্মরণ ১

পাঁচ দশকের লেখকজীবনের সমাপ্তি টেনে চলে গেলেন আবদুর রাকিব। ব্যক্তিজীবনে ধার্মিক হয়েও উদারমনস্ক এই লেখক উপলব্ধি করেছিলেন— ধর্মীয় অনুষঙ্গ ছাড়া বাংলার মুসলিম জনজীবনের যথার্থ চিত্র নির্মাণ সম্ভব নয়। লেখককুলে নিঃসঙ্গ এই মানুষটির প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা। লিখেছেন **আবু রাইহান**

প্রান্তজনের নিঃসঙ্গ কথাকার আবদুর রাকিব

২৩ পাতায়

স্মরণ ২

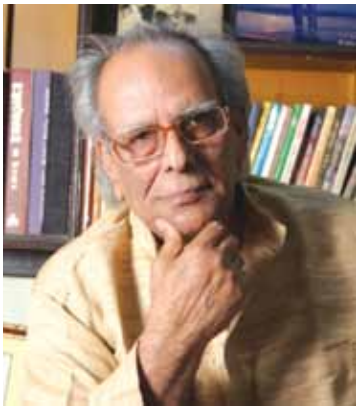

চলে গেলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা উপন্যাসে তাঁর একের পর এক পদচারণা তাঁকে যেমন নিয়ে গেছে বাংলার সিক্ত মাটি-জল-জঙ্গল-মানুষের দিকে, তেমনই তাঁর সেই পথই কখনো-বা মাটি ছাড়িয়ে উঠে গেছে নীল দিগন্তের ঊর্ধ্বে এক আশ্চর্য মায়াজগতে। এ-সংখ্যায় তাঁর প্রতি আমাদের স্মরণলেখা। লিখেছেন **রণজিৎ অধিকারী**

এক লেখকের অলৌকিক যাত্রা

২৮ পাতায়

স্মরণ ৩

নবনীতা দেবসেন আর নেই। তাঁর যাপন-পরিধি ছিল বিশ্বজোড়া। শৈশব থেকে শুধু দেশে নয়, বিদেশেও এমন পরিমণ্ডলে তাঁর বেড়ে ওঠা যে, তাঁর সৃষ্টি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশ-কালের বাধা অতিক্রম করতে চেয়েছে। তীব্র ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি আধুনিক মানুষের বেঁচে থাকার আনন্দ আর বিষাদগুলি। এই লেখাটি তাঁকে আমাদের স্মরণপ্রচেষ্টা। লিখেছেন **পার্থজিৎ চন্দ**

শূন্য হয়ে এল ‘ভালো-বাসা’র বারান্দা

৩৩ পাতায়

অন্যান্য বিভাগ

পাঠকনামা	০৪
সম্পাদকীয়	০৫
উজ্জ্বল প্রান্তনী	৩৭
বঙ্গাদর্শন	৪০
বিশ্ববিচিত্রা	৪৪
রত্ন চতুষ্টয়	৪৮
মুক্তভাষ	৫০
সাত-পাঁচ	৫৩

দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পেছনে বা সামনে লোকের নিন্দা করে।

— আল-কোরআন, সুরা হুমাজা, আয়াত ১

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত: একদা এক ব্যক্তি নবির (স.) দরবারে এসে জানতে চাইল— হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার কাছে সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী কে? তিনি বললেন— তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন— তোমার মা। লোকটি ফের জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন— তোমার পিতা।

— সহিহ্ বোখারি শরিফ, হাদিস সংখ্যা ৫৫৪৬

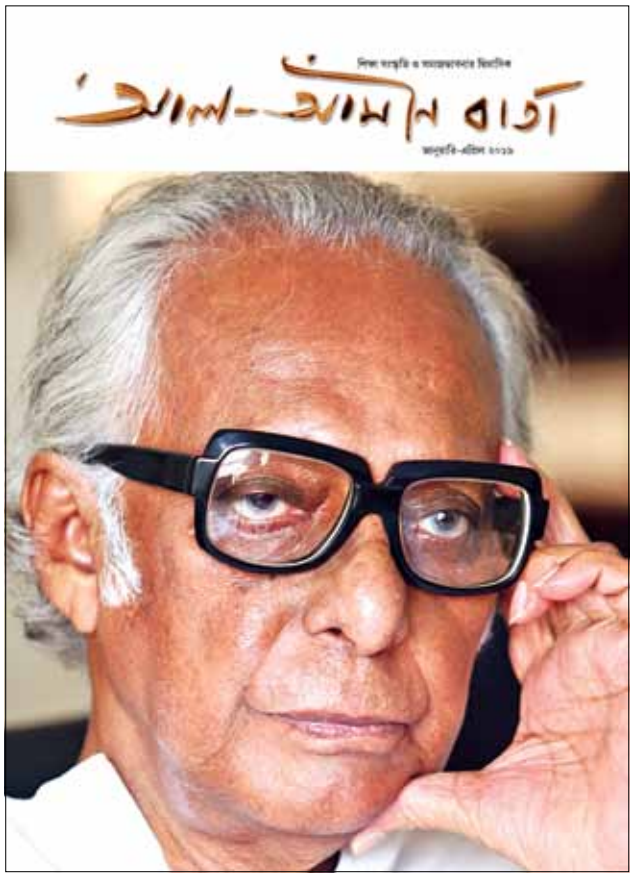

মহান স্রষ্টা, মহান মানুষ

এই প্রথম এমন একটি পত্রিকা পড়লাম, যার নাম 'আল-আমীন বার্তা' (জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৯)। প্রচ্ছদে কিংবদন্তি চলচ্চিত্র-পরিচালক প্রয়াত মৃণাল সেনের উজ্জ্বল ছবি দেখে কৌতূহল হল। তাই কিনে ফেলি। তিনটি লেখা, মৃণাল সেনকে নিয়ে। লেখক সোমেশ্বর ভৌমিক, অধ্যয় কুমার, অনিন্দ্য দত্ত। ছাপান্ন পাতার পত্রিকায় পনেরো পাতা শুধুই মৃণাল সেনকে নিয়ে। পড়ে আশাতিরিক্ত মুগ্ধ হলাম।

প্রথমেই বলি— সোমেশ্বর ভৌমিক যেভাবে মৃণাল সেনের শেষের পাঁচটি ফিল্ম যে-দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন এবং আমাদের দেখিয়েছেন, সেটি নতুন এক মৃণাল সেনকে দেখতে আমাদের সাহায্য করে। 'জেনেসিস', 'এক দিন অচানক', 'মহাপৃথিবী', 'অন্তরীণ' আর 'আমার ভুবন'। লেখক বলছেন— "এই ছবি পাঁচটি মৃণাল সেনের সৃষ্টিভাণ্ডারে এক বিশিষ্ট অথচ ব্যতিক্রমী গুচ্ছ।" কেন? লেখক বলছেন— "ছবিগুলোর প্রতিটি সিকোয়েন্সে মনোযোগী দর্শক অনুভব করবেন পরিচালকের উপস্থিতি, আর-একটু সংবেদী হলে শুনতে পাবেন তাঁর স্বর— সাম্প্রতিক পৃথিবী বিষয়ে তাঁর আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা, উদ্‌বেগ, যন্ত্রণা আর তার মাঝেই কিছু প্রত্যাশা ধারণ করে থাকে সেই স্বর।"

ভয়ংকর সমকালে দাঁড়িয়ে কাকে বলছেন তিনি এসব কথা? শোনার কি কেউ আছে? কারো জন্যে প্রতীক্ষা করেননি তিনি। আর তাই, এ যেন নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া। সংলাপ চলেছে নিজেরই সঙ্গে। অন্য সকলেই সেখানে গৌণ। লেখকের কাছে ছবিগুলি এ-কারণে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। বড়ো ভালো লাগল তাঁর দেখার এই চোখটিকে। অধ্যয় কুমার প্রয়াত পরিচালকের কাছের মানুষ। দেখেছেন অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে। তাঁর চমৎকার লেখার গুণে মৃণাল সেনকে আমরা পাই কাছ থেকে। তিনি তো আমাদের কাছের মানুষই ছিলেন।

অনিন্দ্য দত্ত আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রয়াত পরিচালকের সারাজীবনের যাপন আর চলচ্চিত্র-পরিচালক হয়ে ওঠার কাহিনি। এই পর্বটিও কম আকর্ষণীয় নয়। আমার অনেক অজানা বিষয় জানতে পারলাম তাঁর লেখা পড়ে।

সব শেষে বলব মৃণাল সেনের দরদি মনটির কথা। জানা ছিল না যে, প্রত্যন্ত গ্রামের এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি বেঁধে নিয়েছিলেন নাড়ির বন্ধন। রাজ্যসভার সদস্য তখন। রাজ্যব্যাপী ছড়িয়ে পড়া আল-আমীন মিশনের প্রসারকল্পে নিজের উন্নয়ন-তহবিল থেকে দিয়েছিলেন ৮৮ লক্ষ টাকা। শত ব্যস্ততার মধ্যেই যোগাযোগ রেখেছেন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে। কষ্ট করে একাধিক বার গিয়েছেন দূর খলতপুরে। মিশেছেন ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে। এইসব তথ্য জেনে তাঁর ছবির সামনে আভূমি প্রণত না-হয়ে উপায় থাকে না।

হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হল সেই পুরোনো কথাটি— মহৎ স্রষ্টা হতে গেলে আগে মহৎ মানুষ হতে হবে। মৃণাল সেন ছিলেন তেমনই এক মহৎ মানুষ।

বলতে দ্বিধা নেই, আমার 'আল-আমীন বার্তা' কিনে পড়া সার্থক হয়েছে। পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ।

অনিমেষ সিংহ, বাদামতলা, বর্ধমান

সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রকাশ

'আল-আমীন বার্তা' আমি পেলেই পড়ি। এ-সংখ্যায় (জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৯) প্রয়াত কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্বন্ধে পার্থজিৎ চন্দের লেখাটি মন ভরিয়ে দিল। অত্যন্ত সুলিখিত প্রয়াণলেখাটি কবিকে নতুন করে চিনিয়ে দেয়। যেন নিজের সম্পর্কেই চল্লিশ দশকের এই কবি লিখেছিলেন—

নদীকে সে তার দুঃখ জানাতে এসেছিল;
জানাল না।
সন্ধ্যার আগেই সে তার ঘরে ফিরে এল।

কী সাংঘাতিক কথা! প্রয়াণের পর কবির এই পঙ্‌ক্তি ক-টি অন্য দ্যোতনা এনে দেয়। এই সংখ্যায় হাবিব আর রহমান-সংকলিত ও সম্পাদিত বিস্মৃত ব্যক্তিত্ব ইসমাইল হোসেন সিরাজীর (১৮৮০—১৯৩১) লেখা পড়লাম। এ তো নিছক পুনর্মুদ্রণ নয়, একে বলব পুনরুদ্ধার। বিস্মৃত এক মানুষকে আবার তুলে আনার কাজটি বরাবরই করে 'আল-আমীন বার্তা'। এবং করে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে। মাত্র একান্ন বছরের জীবন। অর্থাভাবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু স্বচেষ্টায় তিনি উচ্চশিক্ষিত হতে পেরেছিলেন। বাংলা প্রদেশে ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা। সুবাগ্মী। তাঁর রচিত সমাজ-বিষায়ক বহু প্রবন্ধ আজও প্রাসঙ্গিক। লিখেছেন বেশ কয়েকটি উপন্যাস। সম্পাদনা করেছেন মাসিক 'নূর' আর সাপ্তাহিক 'সুলতান' পত্রিকা। ১৯০০ সালে দেশাত্মবোধে উজ্জ্বল তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'অনল প্রবাহ' ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল বলিষ্ঠ। খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বলকান যুদ্ধে আহত সেনাদের শুশ্রূষার জন্যে ১৯১৩ সালে তুরস্কে যান ভারতীয় মেডিকেল মিশনের সদস্য হয়ে। বহুবার জেল খেটেছেন। আশ্চর্যের যে, এহেন মানুষটি আমাদের মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছেন!

ধারাবাহিক 'বঙ্গদর্শন' পড়ছি। এ এক অন্য ভ্রমণকাহিনি। লেখক আমাদের স্বদেশ দর্শনে নিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই, তবে সেখানেই আমাদের থামিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায় নেই লেখকের। আমাদের যেন আত্মদর্শন হয়— এমনই আকাঙ্ক্ষা লেখক আশোককুমার কুণ্ডুর।

'বিশ্ববিচিত্রা' আমার প্রিয় বিভাগ। মনে হচ্ছে, আগে বিভাগটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা বেশি ছিল। আর-একটু বেশি জায়গা কি দেওয়া যায় না অনেকের প্রিয় এই বিভাগটিকে?

নিয়াজ মুর্শেদ, কাজিপাড়া, বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগনা

নোবেল পুরস্কারকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান হিসেবে গণ্য করা হয়। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থ বাঙালি, যিনি নোবেল পুরস্কারে পুরস্কৃত হলেন। বহু পুরস্কারে সম্মানিত এবং অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এখন ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতে অর্থনীতি বিভাগে আন্তর্জাতিক অধ্যাপক। অর্থনীতিকে দরিদ্রজনের উপযোগী করে তুলতে, বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্য দূরীকরণে, তাঁর গবেষণা সারাপৃথিবীতে মান্যতা পেয়েছে। তাঁর এবং তাঁর ফরাসি বংশোদ্ভূত স্ত্রী এস্থার দুফলোর লেখা 'পুয়োর ইকনোমিকস: আ র‍্যাডিক্যাল রিথিঙ্কিং অফ দ্য অয়ে টু ফাইট গ্লোবাল পভার্টি', সংক্ষেপে যে-গ্রন্থটি পুয়োর ইকনোমিকস নামে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি পেয়েছে, সেটি বহুল পুরস্কৃত। বাঙালি হিসেবে, ভারতবাসী হিসেবে, আমরা অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য গর্বিত। আমাদের সেই গর্বেরই কথা এ-বারের একটি লেখায় প্রকাশিত হল।

নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ মানুষের জীবনে নেই। কবি লিখেছেন— আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, ...। এত বড়ো আনন্দের মাঝে বিগত দিনগুলোতে আমরা হারিয়েছি বাংলার তিন স্মরণযোগ্য কবি-সাহিত্যিক— অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন এবং আবদুর রাকিবকে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' এক মহাকাব্যিক উপন্যাস। উপন্যাসের পাতাগুলোতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে দীর্ণ বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। নবনীতা দেবসেন কবি, ঔপন্যাসিক, ভ্রমণকাহিনির লেখক। তাঁর রম্যরচনার জনপ্রিয়তা অতুলনীয়। অধিকন্তু, তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত-গবেষকও। আর, আবদুর রাকিব এসবের থেকে দূরে এক প্রান্তিক জনপদের মানুষ। তাঁর গল্পে-উপন্যাসে বিধৃত হয়ে আছে প্রান্তিক মানুষদের সুখ-দুঃখের কথা। এই তিন প্রয়াতজন আমাদের অন্তরের আনন্দ-বেদনাকে মূর্ত রূপ দিয়েছেন। এবং, দূরে কোথাও বেঁচে থাকবার প্রেরণা যে রয়েছে, সে-কথাও লিখে গেছেন। এই সংখ্যায় তাঁদের প্রতি আমাদের বিনীত শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে তিনটি নিবন্ধে।

বৎসরান্তে যেমন, তেমনই সব শেষে বলি পরীক্ষার কথা। আল-আমীন মিশনের পড়ুয়াদের অনন্যতা এইখানে যে, তারা সব পরীক্ষায় এগিয়ে থাকতে চায়। আর পারেও। নিট, জয়েন্ট এন্ট্রান্স, ডব্লিউবিসিএস, উচ্চ-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক— সব পরীক্ষাতেই তারা বরাবরের মতো এ-বারও এগিয়ে থেকে আমাদের গর্বিত করেছে। সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় যেমন তারা উজ্জ্বল, তেমনই রাজ্যের পরীক্ষাগুলোতেও তাদের ফল আশাতিরিক্ত ঝলমলে। অনেকেই র‍্যাঙ্ক করে মিশনের মুখ উজ্জ্বল করেছে। অভিভাবক-অভিভাবিকাদের সঙ্গে আমরা সেই আনন্দ ভাগ করে নিয়েছি। আল-আমীন মিশনের সকল শুভার্থীকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সেরা মেধাবীদের সেরা ঠিকানা

আসাদুল ইসলাম

সর্বভারতীয় পরীক্ষা। ইংরেজি মাধ্যম। এনইইটি নিয়ে তাই কিছু মহলে আশঙ্কা ছিল, কেমন হবে রেজাল্ট? সবাইকে তাক লাগিয়ে এ-বারও ঐতিহ্য রচনা করেছে আল-আমীন। মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিকেও সাফল্যের ধারাবাহিকতা অটুট রেখেছে তারা। সেইসঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিঙের প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও আল-আমীনের পরীক্ষার্থীরা আশাতিরিক্ত সফল।

নিট (ইউজি) মেডিকেল

ডাক্তারি পড়ার ভর্তির পরীক্ষা ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি-কাম-এন্ট্রান্স টেস্ট আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, যাকে আমরা নিট নামেই জানি। সেই নিট পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর থেকেই আল-আমীন মিশন দারুণ ফল করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতা মেনে ২০১৯ সালের পরীক্ষাতেও চমকপ্রদ ফল করেছে। গোটা দেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় ৬০ হাজার সিট আছে এম.বি.বি.এস.-বি.ডি.এস. পড়ার জন্য। ২০১৯ সালের নিট পরীক্ষায় আল-আমীন মিশন থেকে ৫৫ হাজারের মধ্যে র‍্যাঙ্ক করেছে ৪২২ জন ছাত্র-ছাত্রী। এই ৪২২ জনের মধ্যে ছাত্র ৩৬০ জন, ছাত্রী ৬২ জন।

নিট পরীক্ষায় সফল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ক করেছে নদিয়া জেলার তেহট্ট থানার তারানগর গ্রামের কৃষক-পরিবারের সন্তান সামসুল মালিতা। সর্বভারতীয় স্তরে তার র‍্যাঙ্ক ১৮৮৩। সামসুলের পিতা সুকলাল মালিতা এবং মা সাবিনা ইয়াসমিনের পড়াশোনা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। তার ভাই তুহিন মালিতা নবম শ্রেণিতে পড়ছে। মাধ্যমিকের গণ্ডি না পেরোনো একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে ডাক্তার হতে চলেছে সামসুলের হাত ধরে। সামসুল আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়েছিল একাদশ শ্রেণিতে। মাধ্যমিকে সে পেয়েছিল ৭৫.১৩ শতাংশ নম্বর। দু-বছর মিশনের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করে, উচ্চ-মাধ্যমিক মাধ্যমিকের তুলনায় অনেক কঠিন হওয়া সত্ত্বেও, উচ্চ-মাধ্যমিকে সে পেয়েছিল ৯০.৬ শতাংশ নম্বর। আল-আমীন মিশনেই আরও এক বছর নিটের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার পর সে চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করেছে। আল-আমীন মিশন মেধাবী এই ছাত্রকে অর্ধেক ছাড়ে পড়ার সুযোগ দিয়েছিল। ভবিষ্যতে সামসুল হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ হতে চায়। মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানার কুচিডাঙা গ্রামের সন্তান মহম্মদ ইব্রাহিম। তার পিতা মুহাম্মদ সেখ সাদি রহমতুল্লাহ বিজ্ঞানে স্নাতক। মা রাজিয়া খাতুন মাধ্যমকি পাস। চাষবাসই ভরসা তাঁদের। শিক্ষার প্রতি ভালোবাসা ছিল বলেই ইব্রাহিমের পিতা-মাতা চাইতেন তাঁদের ছেলে ডাক্তার হবে। আব্বা-মার সেই আশা পূরণ করেছে ইব্রাহিম। আল-আমীন মিশন থেকে নিট পরীক্ষায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ক হয়েছে ইব্রাহিমের। সর্বভারতীয় স্তরে তার র‍্যাঙ্ক ২০৬৬। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকে ভালো ফল করেছিল ইব্রাহিম। মাধ্যমিকে পেয়েছিল ৬৫২ এবং উচ্চ-মাধ্যমিকে পেয়েছিল ৪৫৪ নম্বর। মিশনের নয়াবাজ শাখাতে এক বছর নিট কোচিং নেওয়ার পর এ-বছর তার এমন চমকপ্রদ ফল।

সিরাজ কবীরের বাড়ি মালদা জেলার গাজোল থানার কোইল গ্রামে। পিতা আজিরুদ্দিন সরদার মা শাহনওয়াজ বেগম। কৃষক-পরিবারের সিরাজ কবীর মাধ্যমিকে ৮২.২ শতাংশ ও উচ্চ-মাধ্যমিকে ৮৮.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করার পর স্বপ্ন দেখতে শুরু করে ডাক্তার হওয়ার। ২০১৭ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করার পর, দু-বছরের চেষ্টা চালিয়ে ২০১৯ সালে সে শুধু সফলই হয়নি, নজরকাড়া ফল করেছে নিট পরীক্ষায়। তার র‍্যাঙ্ক হয়েছে ৩৪৫৬। ওবিসি র‍্যাঙ্ক ১০৩৯। আল-আমীন মিশনের নিট-এ সফল হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চতুর্থ সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ক করেছে সিরাজ কবীর।

আল-আমীন মিশন থেকে এরকম যেসব ছেলে-মেয়েরা নিট পরীক্ষায় সফল হয়েছে বা হচ্ছে, তাদের বেশিরভাগই নিম্নবিত্ত পরিবারের কম পড়াশোনা জানা পিতা-মাতার সন্তান। যেমন পূর্ব বর্ধমান জেলার নাদনঘাট থানার সিংজুলি গ্রামের আজমত মণ্ডল মাত্র ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছেন। তাঁর স্ত্রী হানুফা বিবি এইট পাস। চাষবাস ছাড়া আজমত মণ্ডল আর-কীই-বা করবেন। তাঁর পুত্র তৌসিন মণ্ডল ডাক্তার হতে চলেছে। মিশনের নয়াবাজ শাখা থেকে নিট কোচিং নিয়ে তার র‍্যাঙ্ক হয়েছে ১২০৪৪। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর থানার তিলপি গ্রামের মুহাম্মদ আমানুল্লাহ শেখ আবার দিনমজুর। বয়স হয়ে যাওয়ায় দিনমজুরিও করতে পারেন না। তাঁর স্ত্রী মারজান বিবি সন্তানদের পড়াশোনার প্রতি সজাগ। তাঁদের পুত্র আরিফ বিল্লাহ মাধ্যমিকে ৯১ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাস করার পর তাকে আল-আমীন মিশনের হেফাজতে দেন আরও বড়ো সাফল্যের দিকে এগিয়ে দিতে। আরিফ মিশন থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক দিয়ে পেয়েছিল ৮৭.২ শতাংশ নম্বর। নিটের কোচিং এক বছর নেওয়ার পর পরীক্ষায় বসে এ-বছর তার র‍্যাঙ্ক হয়েছে ৭৮৭০। এরকম পরিবারের সন্তান নদিয়া জেলার বড়োচাঁদ ঘর গ্রামের মুন্না মল্লিক। মিশনে ক্লাস ফাইভ থেকে পড়া মুন্নার র‍্যাঙ্ক হয়েছে ১৯৯০০। মুন্নার আব্বা-মা দু-জনেই মাধ্যমিক পাস। পরিবারের আয়ের উৎস কৃষিকাজ। এরকম অজস্র উদাহরণ মজুত হাতের কাছে। আল-আমীন মিশনের হাত ধরে এ-বছর ডাক্তারি পড়তে সুযোগ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায় ৭০ শতাংশই এমন পরিবারের।

সামসুল মালিতা। সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৮৮৩।

এবার আমরা আসি নিট পরীক্ষায় ছাত্রীদের সাফল্যের কথায়। আগেই জানিয়েছি এ-বছর মিশন থেকে প্রায় ৬০ জন মেয়ে ডাক্তারি পড়ার

সুযোগ পেয়েছে। গতবছর এই সংখ্যাটা ছিল একশোর কাছাকাছি। একসময় মুসলমান ডাক্তার মেয়ে খুঁজে পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হত। আল-আমীন মিশনের হাত ধরে 'লেডি ডক্টর'-এর আকালও কমেছে অনেকটাই। সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে মেয়ে ডাক্তারদের উজ্জ্বল উপস্থিতি নজরে আসবে সকলের।

বিস্তারিত লেখার পরিসর কম। তাই এবার মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে যে-মেয়েটি, তার কথা বলে নিট ফল নিয়ে আলোচনা শেষ করব। আল-আমীন মিশন থেকে এ-বছর নিট পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে তাওহিদা নাসরিন।

মহম্মদ ইব্রাহিম। সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২০৬৮।

হুমায়ুন লস্কর। সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৭৫৩।

নিট পরীক্ষায় সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্ক করেছে নদিয়া জেলার কৃষক পরিবারের সন্তান সামসুল মালিতা। সর্বভারতীয় স্তরে তার র‍্যাঙ্ক ১৮৮৩। সামসুলের পিতা সুকলাল মালিতা, মা সাবিনা ইয়াসমিনের পড়াশোনা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত।

তাওহিদার বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানার দাউদপুর গ্রামে। তার পিতা মোশারফ হোসেন রসায়ন বিষয়ে পিএইচ.ডি. করেছেন। একটি বি.এড. কলেজের অধ্যক্ষ। তাওহিদার মা আয়েশা সিদ্দিকা স্নাতক। তাওহিদার এক দিদি বর্তমানে ডাক্তারি পড়ছেন। মোশারফ সাহেব নিজে দীর্ঘদিন আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থার পঠন-পাঠন, পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি মেয়ের সাফল্যের জন্য ভরসা করেছেন আল-আমীন মিশনকেই। মেধাবী তাওহিদা আল-আমীন মিশনে নিট কোচিং নিয়েছিল এক বছর। ২০১৬ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক দেওয়ার পর তাঁর ডাক্তারি পড়ার স্বপ্ন অধরা থেকে যাচ্ছিল। নাছোড় মনোভাব আর আল-আমীনের সঠিক গাইডেন্স তাকে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। এম.বি.বি.এস. শেষ করার পরই পরবর্তী ধাপ নিয়ে ভাবতে চায় সে।

আল-আমীন মিশনের ধারাবাহিক সাফল্যের মাঝে আরও একটি সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় আছে বরাবরের মতো এবারও। মুর্শিদাবাদ এবং মালদা জেলা রাজ্যের তো বটেই দেশের মধ্যেও অন্যতম পশ্চাৎপদ জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম। আল-আমীন মিশনের হাত ধরে এই জেলার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাকে হাতিয়ার করে এগিয়ে যাওয়ার দাবি লক্ষ করা যাচ্ছে। বর্তমানে আল-আমীন মিশনে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সবার ওপরে আছে মুর্শিদাবাদ, তারপরেই মালদা। নিট পরীক্ষায় সফলদের তালিকাতেও সবার ওপরে এই দুই জেলার অবস্থান। নিট পরীক্ষায় সফল ৪২২ জনের মধ্যে শুধু মুর্শিদাবাদ থেকেই আছে ১০৫ জন। আর মালদা জেলা থেকে সফল ৮০ জন। পশ্চাৎপদতার নিরিখে রাজ্যের অন্যতম জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। বিস্ময়কর মনে হলেও, বাস্তব হল, এই জেলাও আল-আমীন মিশনের শিক্ষা বিকাশের কর্মযজ্ঞে শামিল হয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নিট ফলে সেই ছবি ধরা পড়েছে। মুর্শিদাবাদ, মালদার পরেই আছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। এই জেলা থেকে সফল হয়েছে ৫৪ জন। সফলদের অর্ধেকেরও বেশি এই তিন জেলার। আল-আমীন মিশনের কাছে বিশেষ তৃপ্তির বিষয় হল, যে-জেলার মানুষজন বেশি পশ্চাৎপদ, সেই জেলার মানুষদেরই উন্নয়নের আঙিনায় পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে বেশি করে। যাঁরা বেশি আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে, তাঁদের পাশেই বেশি করে দাঁড়ানোর কর্তব্য ঠিক-ঠিকভাবে পালন করা যাচ্ছে— এরচেয়ে বড়ো ভালো লাগা সমাজসেবী একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আর-কীই-বা হতে পারে!

উচ্চ-মাধ্যমিক

আল-আমীন মিশন থেকে এ-বছর মোট ১৮০৫ জন ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। ১৭-টি বালক শাখা থেকে মোট ১১৩৭ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছিল। অন্যদিকে ১৬-টি বালিকা শাখা থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল ৬৬৮ জন ছাত্রী। এই ১৮০৫ জনের মধ্যে কেবলমাত্র তিনটি বালিকা শাখার ৩৩ জন পরীক্ষার্থী ছিল কলা বিভাগের, বাকি ১৭৭২ জন ছিল বিজ্ঞান বিভাগের পড়ুয়া। ১৮০৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৯০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়ে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৩১ জন। ২৩১ জনের মধ্যে কলা বিভাগের ১১ জন ছাত্রীও আছে। ৮০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়ে পাস করেছে ১১২১ জন। মোট পরীক্ষার্থীর ৬২.১ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী ৮০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়ে পাস করেছে। আর ৬০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়ে পাস করে ৯৯.৮ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী।

এ-বছর মাধ্যমিক এবং উচ্চ-মাধ্যমিক— এই দুটি পরীক্ষাতেই মেয়েরা মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হয়েছে। মিশনের মধ্যে প্রথম এবং রাজ্যস্তরের ৭ লক্ষ ৭৭ হাজার ২৬৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মেধাতালিকায় সপ্তম স্থান দখল করেছে উলুবেড়িয়া ক্যাম্পাসের ছাত্রী সাফিদা খাতুন। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯ (৯৭.৮ শতাংশ)।

সিরাজ কবির। সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩৪৫৬।

তৌহিদা নাসরিন। সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৪৫২৮।

উচ্চ-মাধ্যমিকে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আল-আমীনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম।

সাফিদার বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানার রাধাকান্তপুর গ্রামে। বি.এ. প্রথম বর্ষ পর্যন্ত পড়া তার পিতা আবদুস সালাম চাষবাস করেন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া মা সাহিনা বেগম গৃহবধূ। সাফিদার এক ভাই একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। দিদি শাকিলা খাতুন আল-আমীন মিশনের পাথরচাপুড়ি শাখা থেকে পড়াশোনা করে বর্তমানে বি.এসসি. নার্সিং পড়ছেন। কৃষিজীবী

মেধাতালিকায় সপ্তম স্থান পেয়েছে উলুবেড়িয়া ক্যাম্পাসের সাফিদা খাতুন। প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯ (৯৭.৮ শতাংশ)। সাফিদার বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে। নিম্নবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছাত্রী হিসেবে সে অর্ধেক বেতন দিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল।

পরিবারের সন্তান সাফিদা স্থানীয় ধুলাউড়ি হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাস করার পর একাদশ শ্রেণিতে মিশনে ভর্তি হয়েছিল। মাধ্যমিকে পেয়েছিল ৯৪.২৮ শতাংশ নম্বর, উচ্চ-মাধ্যমিকে বেড়ে হয়েছে ৯৭.৮ শতাংশ। নিম্নবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছাত্রী হিসেবে সে অর্ধেক বেতন দিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। মিশনের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী কাজী ফাইয়াজ আহমেদ রাজ্যস্তরে অষ্টম স্থান পেয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৮ (৯৭.৬ শতাংশ)। আল-আমীন মিশনের নয়াবাজ শাখায় পড়াশোনা করেছে ফাইয়াজ। মিশনে ভর্তি হয়েছিল একাদশ শ্রেণিতে। মাধ্যমিকেও সে ৯৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছিল। ফাইয়াজ আহমেদের বাড়ি হুগলি জেলার চণ্ডীতলা থানার চাঁদপুর গ্রামে। তার পিতা কাজী রকুব আলি বি.কম. পাস, গৃহশিক্ষকতা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। মেধাবান ফাইয়াজ বিশেষ আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল মিশন। অর্ধেকেরও কম বেতনে তাকে পড়ার সুযোগ দিয়েছে। রাজ্যস্তরে অষ্টম হওয়া ফাইয়াজ স্বপ্ন দেখে আই.এ.এস. হওয়ার। তবে সে এম.বি.বি.এস. করার পরই ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিসট্রেটিভ সার্ভিসে যেতে চায়। দক্ষিণ ভারতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এমন প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। পূর্ব ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ছেলেমেয়েদের ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পর অন্য পেশায় যাওয়ার উদাহরণ খুবই কম দেখা যায়। ক্রিকেট খেলতে এবং কবিতা লিখতে ভালোবাসে ফাইয়াজ। সে মনে করে ভারতের গরিবি দূর করার একমাত্র হাতিয়ার হল শিক্ষা। প্রশাসনে অংশ নিয়ে দেশের অবস্থা বদল করতে নিজের ভূমিকা পালন করতেই সে আই.এ.এস. হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

মিশন থেকে তৃতীয় এবং রাজ্যস্তরে ১৪-তম স্থান পেয়েছে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার জঙ্গীপুর সাহেববাজারের মেয়ে সেখ শাহরিয়া তৃষা। বহরমপুর শিল্পমন্দির উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিকে ৭৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করে আল-আমীনে পড়তে আসে তৃষা। উচ্চ-মাধ্যমিকে সে পেয়েছে ৯৬.৪ শতাংশ নম্বর। খুব ছোটোবেলাতেই পিতাকে হারিয়ে তৃষা অনাথ হয়ে যায়। বি.এ. পাস তার মা হোসনেতারা বিশ্বাস তৃষাকে পরম মমতায় বড়ো করে তোলেন। শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকা স্বপ্ন দেখতেন মেয়েকে সমাজের একজন হিসেবে গড়ে তোলার। আল-আমীন মিশন সেই স্বপ্নকে সাকার করতে কয়েক

রাজ্যে সপ্তম।
সাফিদা খাতুন। ৪৮৯ (৯৭.৮%)

রাজ্যে অষ্টম।
কাজী ফাইয়াজ আহমেদ। ৪৮৮ (৯৭.৬%)

ধাপ এগিয়ে দিয়েছে তৃষাকে। তৃষাকে অল্প বেতনে পড়ার সুযোগ দেয় মিশন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নজর-কাড়া ফল করেছে সে। শাহরিয়া তৃষা কলা বিভাগের ছাত্রী। কলা বিভাগ থেকেই, সব বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে রাজ্যস্তরে ১৪-তম স্থান পেয়েছে। ছবি আঁকতে ও সাহিত্যপাঠে আগ্রহী তৃষা ভবিষ্যতে ডব্লিউ.বি.সি.এস. অফিসার হতে চায়। সেই লক্ষ্যে সে বর্তমানে কলকাতার লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে পড়াশোনা করছে।

নিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চতুর্থ এবং রাজ্যস্তরে ১৮-তম স্থান পেয়েছে দু-জন ছাত্র। সেই দু-জনের একজন হল মাসুদ মণ্ডল। মাসুদের বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাগদা থানার আমডোব গ্রামে। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়া পিতা লতিফ মণ্ডল পেশায় কৃষক। ক্লাস এইট পাস মা ডলিফা মণ্ডল গৃহবধূ। ২০১৭ সালে আমডোব হাই স্কুল থেকে ৮৩ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাস করার পর আল-আমীন মিশনে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয় মাসুদ। আল-আমীন মিশনের খলিশানি শাখায় পড়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে। উচ্চ-মাধ্যমিকে সে মাধ্যমিকের তুলনায় খুবই উজ্জ্বল ফল করে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৮ (৯৫.৬ শতাংশ)। মাসুদের এক দিদি আছে, ক্লাস টুয়েলভে পড়ে। বিঘে দুই জমির মালিক তার পিতা লতিফ মণ্ডল চাষের উপার্জন থেকে সংসার চালিয়ে কষ্ট করে ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা শেখাচ্ছেন। আল-আমীন মিশন এই নিম্নবিত্ত কৃষকপরিবারের পাশে দাঁড়াতে মাসুদের বেতনে অনেকটাই ছাড় দিয়েছে। অর্ধেক বেতন দিয়ে সে পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মাসুদ ভবিষ্যতে হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হতে চায়।

রাজ্যস্তরে ১৮-তম স্থান পাওয়া অপর ছাত্রের নাম আরসাদ আলি মণ্ডল। আরসাদের বাড়ি বীরভূম জেলার দুবরাজপুর থানার পাছিয়াড়া গ্রামে। তার পিতা আনসার আলি মণ্ডল বি.এসসি. পাস, শিক্ষকতা করেন। মা ওয়াহিদ বিবিও বি.এসসি. পাস। আরসাদের দিদি নাজিয়া সুলতানা, আল-আমীন মিশনের প্রাক্তন ছাত্রী, বর্তমানে বি.এসসি. পড়ছেন। আরসাদ আল-আমীন মিশনের নয়াবাজ শাখায় পড়াশোনা করেছে। চাকরিজীবী পিতার সন্তান হওয়ায় সম্পূর্ণ বেতন দিয়েই পড়াশোনা করেছে সে। গল্পের বই পড়তে এবং ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে আরসাদ। সে ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায়।

রাজ্যস্তরের মেধাতালিকার প্রথম কুড়ির মধ্যে মিশনের আছে আরও দু-জন পড়ুয়া। একজন কলা বিভাগের এবং একজন বিজ্ঞান বিভাগের। দু-জনেই ১৯-তম স্থান পেয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র রোহিতুল আলম ৪৭৭ (৯৫.৪ শতাংশ) নম্বর পেয়ে ১৯-তম স্থান পেয়েছে। রোহিতুলের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার তালগ্রাম গ্রামে। তার পিতা রবিউল আলম মাধ্যমিক পাস, মুরগির মাংস বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। রোহিতুলের মা এবি বিবি পড়াশোনা জানেন না। তার দুই বোন— একজন একাদশ শ্রেণিতে এবং অন্যজন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। রোহিতুল ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে গ্রামের বিদ্যালয় তালগ্রাম হামিদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠে। সপ্তম শ্রেণি থেকে সে আল-আমীন মিশনের ছাত্র। পড়াশোনা করত মাধ্যমিক পর্যন্ত উজুনিয়া শাখায়, আর উচ্চ-মাধ্যমিকটা পড়েছে নয়াবাজ শাখায়। মাধ্যমিকে সে পেয়েছিল ৯৪.৩ শতাংশ নম্বর। প্রথম চার বছর সে বিনা বেতনে পড়েছে মিশনে। উচ্চ-মাধ্যমিকে অর্ধেকের চেয়েও কম বেতন দিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। প্রান্তিক পরিবারের সন্তান রোহিতুল চিকিৎসক হয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে সমাজের পাশে থাকতে চায়।

আল-আমীন মিশন থেকে এ-বছর তিনটি শাখায় ৩৩ জন ছাত্রী কলা বিভাগে পড়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। এই ৩৩ জনের মধ্যে পাথরচাপুড়ি শাখার দু-জন ছাত্রী রাজ্যস্তরে প্রথম কুড়ি জনের মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছে। ১৪-তম স্থান পাওয়া শাহরিয়া তৃষার কথা আগেই বলেছি। ১৯-তম স্থান পেয়েছে হালিমা পারভিন। হালিমার বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বারুইপুর থানার কুলারি গ্রামে। হালিমার পিতা হাবিবুর রহমান মাধ্যমিক পাস, ব্যাবসা করেন। মা সাবিনা বিবি উচ্চ-মাধ্যমিক পাস, গৃহবধূ। হালিমার আর দুটো বোন আছে। তাদের একজন ক্লাস টেন-এ, অন্যজন ক্লাস থ্রিতে পড়ে। হালিমা গ্রামের স্কুলে এইট পর্যন্ত পড়ার পর আল-আমীন মিশনে ক্লাস নাইনে ভর্তি হয়। মাধ্যমিকে পেয়েছিল ৮১ শতাংশ নম্বর। পাথরচাপুড়ি শাখা থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে সে পেয়েছে ৯৫.৪ শতাংশ নম্বর। এক-চতুর্থাংশ ছাড় পেয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে হালিমা। কবিতা লিখতে ও কবিতা পড়তে ভালোবাসে সে। ভবিষ্যতে হালিমা ডব্লিউ.বি.সি.এস. অফিসার হয়ে দেশ গড়ার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চায়।

আল-আমীন মিশন থেকে ২০১৯ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যস্তরে প্রায় আট লাখ ছাত্র-ছাত্রীর ভেতর প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে থাকা সাত জন ছাত্র-ছাত্রীর ফল নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। মোট ১৮০৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী অত্যন্ত ভালো ফল করেছে। প্রায় প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়েই আলাদা করে লেখা যায়। কিন্তু সে-পরিসর একটি পত্রিকার একটি সংখ্যার কয়েকটি পাতায় থাকার কথা নয়। তাই সব-কটা লেখা গেল না। শুধু একটা কথা বলার, একটি একক প্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রী নজরকাড়া ফল করছে, একটা শক্তপোক্ত ভিত পেয়ে যাচ্ছে, যার ওপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের উচ্চশিক্ষার দিগন্তে পাখা মেলতে পারবে সহজভাবে, এটা কম বড়ো ব্যাপার নয়। বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখলে সকলেই স্বীকার করবেন, রাজ্যে এমন নজির অতীতে ছিল না, বর্তমানেও নেই। সম্ভবত এই কারণেই আল-আমীন মিশন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সেরা গন্তব্য হয়ে উঠেছে। হয়ে উঠেছে সত্যিকারের স্বপ্নপ্রতিষ্ঠান।

রাজ্যে ১৪-তম।
সাহারিয়া তৃষা। ৪৮২ (৯৬.৪%)

রাজ্যে ১৪-তম।
সাহিল পারভেজ। ৪৮২ (৯৬.৪%)

মাধ্যমিকে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আল-আমীনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম।

মাধ্যমিক

২০১৯ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চমকপ্রদ ফল করেছে আল-আমীন মিশন। এ-বছর আল-আমীন মিশনে ২৭-টি বালক শাখা এবং ১২-টি বালিকা শাখা থেকে মোট ১৫০৭ জন ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। ছাত্র ছিল ১০৩৯ জন, ছাত্রী ছিল ৪৬৮ জন। পরীক্ষার ফল বের হলে রাজ্যের মানুষের, বিশেষ করে সংখ্যালঘু মুসলমানদের কৌতূহল কেন্দ্রীভূত হয় একটি প্রশ্নে— আল-আমীন থেকে রাজ্যস্তরে প্রথম দশ বা কুড়ি জনের মধ্যে ক-জন আছে। ২০১৯ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের ১০ লক্ষ ৫০ হাজার ৫৫৮ জন ছাত্র-ছাত্রীর ভেতরে প্রথম ২০ জনের মধ্যে আল-আমীন মিশনের ছাত্র-ছাত্রী আছে চার জন। মিশনের মধ্যে প্রথম এবং রাজ্যে ১৪-তম স্থান দখল করেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বেলপুকুর শাখার ছাত্রী সুমাইয়া খাতুন। ৯৬.৭ শতাংশ নম্বর পেয়েছে সে। ৯৬.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে মিশনের মধ্যে দ্বিতীয় এবং রাজ্য স্তরে ১৫-তম স্থান পেয়েছে বীরভূমের পাথরচাপুড়ি শাখার ছাত্র আশিক ইকবাল। রাজ্যে ১৮-তম স্থান পেয়েছে আফতাব মোল্লা এবং ২০-তম স্থান পেয়েছে আখতারা পারভিন।

রাজ্যস্তরে ১৪-তম স্থান পাওয়া সুমাইয়া খাতুনের বাড়ি মালদা জেলার হরিশচন্দ্রপুর থানার সোনাকুল গ্রামে। পিতা সামিম আখতার শিক্ষক। সুমাইয়া বেলপুকুর ক্যাম্পাসে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল। সে ভবিষ্যতে স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হতে চায়।

একটা কথা বার বার বলার, যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কতটা ভালো, তা কেবল এক-দুজন ছাত্র-ছাত্রীর ভালো ফল দিয়ে বিচার করা যুক্তিযুক্ত নয়। পড়াশোনা ভালো হচ্ছে কি না, তা দেখতে গেলে বিশ্লেষণ করা দরকার সেই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ফল। আল-আমীন মিশনকেও এই নিয়মের মধ্যে ফেলে বিচার করা দরকার। এ-বছর যে ১৫০৭ জন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল, তাদের ফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ৩১০ জন, যা মোট ছাত্র-ছাত্রীর ২০.৬ শতাংশ। AA (৯০ শতাংশ) গ্রেডের পরই A+ গ্রেড (৮০ শতাংশ)। ৮০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০২১ জন। মোট ছাত্র-ছাত্রীর ৬৭.৮ শতাংশ A+ গ্রেড নিয়ে পাস করেছে। ৯৬ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী A গ্রেড অর্থাৎ ৬০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়ে পাস করেছে। শুধু ২০১৯ সালেই সার্বিক ফল এমন উজ্জ্বল হয়েছে তা নয়, ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছর এমন ফল করছে আল-আমীন মিশনের পড়ুয়ারা। 'আল-আমীন বার্তা'র নিয়মিত পাঠক মানেই এই দাবির সত্যতা সম্পর্কে অবহিত। গত কয়েক বছরের সংখ্যাটা দেখলেই মিলিয়ে নিতে পারবেন সহজেই। এবার আমরা আল-আমীন মিশনের শাখাওয়ারি ফলের ওপর একটু আলোকপাত করব। আগেই বলেছি, ২৭-টি বালক শাখা এবং ১২-টি বালিকা শাখা থেকে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। বালক শাখাগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর (৬৭৬) প্রাপক আশিক ইকবাল পাথরচাপুড়ি শাখার, তা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বর ৬৬৯ পেয়েছে খলতপুর এবং বেলপুকুর— এই দুই শাখার ছাত্র। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যার নিরিখে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার্থী ছিল খলতপুর শাখায়— ১০৫ জন। তারপর বেলপুকুর শাখায়— ৮৮ জন। পাথরচাপুড়ি শাখা ছিল তিন নম্বরে— ৮৫ জন পরীক্ষা দিয়েছিল এই শাখা থেকে। সর্বোচ্চ নম্বরের দিকে এই তিন শাখা পাশাপাশি থাকলেও গড় ভালো নম্বর করার দিক দিয়ে সবার ওপরে আছে বাঁকুড়া শাখা। ৯০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে এই শাখার ৫০ শতাংশ ছাত্র। ৯০ শতাংশ

রাজ্যে ১৪-তম।
সুমাইয়া খাতুন। ৬৭৭ (৯৬.৭%)

রাজ্যে ১৫-তম।
আশিক ইকবাল। ৬৭৬ (৯৬.৬%)

বা তার বেশি নম্বর পাওয়া এর পরের দুটি শাখা হল— মহম্মদপুর (৪৭.৬ শতাংশ) এবং মেদিনীপুর (৪২.৯ শতাংশ)। এবার A+ গ্রেডের (৮০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর) বিচারে দেখলেও দেখা যাচ্ছে সবার ওপরে আছে বাঁকুড়া শাখা। ১০০ শতাংশ অর্থাৎ সব ছাত্রই ৮০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়ে পাস করেছে। এর পরে আছে মেদিনীপুর শাখা। এই শাখায় ৯৬.৪ শতাংশ ছাত্র ৮০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়ে পাস করেছে। A+ গ্রেড পাওয়ার ক্ষেত্রে তৃতীয় স্থানে আছে মহম্মদপুর শাখা। এই শাখার ফল— ৯৫.২ শতাংশ ছাত্র A+ গ্রেড পেয়েছে। প্রতিটি শাখার ফল নিয়ে বিস্তারিত লেখার সুযোগ নেই, তাই এবার বালিকা শাখা নিয়ে একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক। বেলপুকুর শাখা থেকে এ-বছর মিশনের সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপকই আসেনি কেবল, AA গ্রেড (৯০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর) পাওয়ার ক্ষেত্রেও মেয়েদের সব শাখাকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। এই শাখার ৩৬.৭ শতাংশ ছাত্রী ৯০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়ে পাস করেছে। এরপর আছে পাথরচাপুড়ি শাখা। এই শাখার AA গ্রেড পাওয়া ছাত্রীর হার ২৭ শতাংশ। ২০ শতাংশ ছাত্রী AA গ্রেড পেয়ে ধুলিয়ান শাখা আছে তিন নম্বর স্থানে। A গ্রেড (৮০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর) পাওয়ার ক্ষেত্রে সবার ওপরে ধুলিয়ান শাখা। ধুলিয়ান শাখায় ৮১.৪ শতাংশ ছাত্রী ৮০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়ে পাস করেছে। দ্বিতীয় স্থানে আছে বেলপুকুর (৭৯.৬ শতাংশ) এবং তৃতীয় স্থানে পাথরচাপুড়ি (৬৯.৮ শতাংশ) শাখা।

এরপর আমরা কয়েক জন ছাত্র-ছাত্রীর ফল নিয়ে আলোচনা করব। মিশনের মধ্যে প্রথম এবং রাজ্যস্তরে ১৪-তম স্থান পাওয়া সুমাইয়া খাতুনের বাড়ি মালদা জেলার হরিশচন্দ্রপুর থানার সোনাকুল গ্রামে। পিতা সামিম আখতার শিক্ষকতা করেন। সুমাইয়া বেলপুকুর ক্যাম্পাসে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল। পূর্ণবেতন দিয়ে পড়াশোনা করেছে। সে ভবিষ্যতে স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হতে চায়। এই লক্ষ্য পূরণে আল-আমীন মিশনেই নতুন উদ্যোমে পড়াশোনা শুরু করেছে। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী আশিক ইকবাল রাজ্যস্তরে ১৫-তম স্থান পেয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৬.৫৭ শতাংশ। পাথরচাপুড়ি শাখায় নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল আশিক। আশিকের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি থানার কাবিলপুর গ্রামে। আশিকের পিতা আব্দুর রফ পেশায় শিক্ষক। মিশনের মধ্যে তৃতীয় এবং রাজ্যস্তরে ১৮-তম স্থান পেয়েছে আফতাব মোল্লা। আফতাবের বাড়ি বীরভূম জেলার নলহাটী থানার মধুরা গ্রামে। উচ্চ-মাধ্যমিক পাস তার পিতা মহম্মদ আশির মোল্লার পেশা কৃষিকাজ। বেতনে এক চতুর্থাংশ ছাড় পেয়ে আফতাব পাথরচাপুড়ি শাখায় পড়াশোনা করেছে। মাধ্যমিকে ৯৬.১৪ শতাংশ নম্বর পাওয়া আফতাব ভবিষ্যতে চিকিৎসক হতে চায়। বর্তমানে আল-আমীনের নয়াবাজ শাখায় সে পড়াশোনা করছে। আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখার ছাত্রী আখতারা পারভিন রাজ্যস্তরে ২০-তম স্থান দখল করেছে। বীরভূম জেলার মুরারই থানার রূপরামপুর গ্রামের

আশিক ইকবাল রাজ্যস্তরে ১৫-তম স্থান পেয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৬.৫৭ শতাংশ। পাথরচাপুড়ি শাখায় নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল আশিক। আশিকের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি থানার কাবিলপুর গ্রামে।

মেয়ে আখতারার মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বর ৬৭১, শতাংশের হিসেবে ৯৫.৯। আখতারার পিতা আক্তার আলম সাম্মানিক স্নাতক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। সপ্তম শ্রেণি থেকে আখতারা পড়ছে মিশনে। পূর্ণবেতন দিয়েই পড়ে। এখন সে আল-আমীনের খলতপুর শাখাতেই পড়াশোনা করছে। তার ভবিষ্যৎ-লক্ষ্য চিকিৎসক হওয়া। ৯০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩১০ জন। এবং প্রতিটি পড়ুয়াকে নিয়েই আলাদা করে লেখা যায়। কিন্তু পরিসর কম হওয়ায় প্রথম চার স্থানাধিকারীকে নিয়ে লিখে এ-প্রসঙ্গে ইতি টানা হল।

মেদিনীপুর শাখায় শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে আজহারউদ্দীন খানের গ্রন্থ প্রকাশ

রাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা আল-আমীন মিশনের সমস্ত শাখায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শিক্ষক দিবস উৎযাপিত হয়। এই উপলক্ষে মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম মিশনের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বেশি বেশি মরমি ও দরদি হতে অনুপ্রাণিত করেন। মিশনের মেদিনীপুর শাখায় এই অনুষ্ঠান এক অন্য মাত্রা পায়, কারণ, এই অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সাহিত্যিক আজহারউদ্দীন খানের 'দীপ্ত আলোর বন্যা' গ্রন্থের ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ হয়। এটির প্রকাশক, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার যশোড়া বিদ্যাসাগর মানব বিকাশ কেন্দ্র। এই সংস্থার সভাপতি ভূতপূর্ব অধ্যাপক ড. শচীনন্দন সাউ এবং প্রাক্তন শিক্ষক অশোক পাল। গ্রন্থটি প্রকাশের পর আজহারউদ্দীন খানের হাতে এম নুরুল ইসলামের শুভেচ্ছাবার্তার স্মারক তুলে দেওয়া হয়। এটি তুলে দেন আল-আমীন মিশন, খলতপুর থেকে বিশিষ্ট প্রতিনিধি সেখ মোমিনুর রহমান।

পবিত্র কোরআন পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষক দিবসের গুরুত্ব ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন সম্পর্কে আলোচনা করেন। ছাত্র-ছাত্রীরাও রাধাকৃষ্ণনের জীবনী নিয়ে বক্তব্য রাখে। কবিতা, গান ও আলোচনায় সকাল থেকেই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান।

দ্বিতীয় পর্বে প্রখ্যাত নজরুলগবেষক আজহারউদ্দীন খানের 'দীপ্ত আলোর বন্যা' গ্রন্থের শুভ প্রকাশ ঘটে। এই মহতী সভায় গ্রন্থের রচয়িতা বলেন, "লেখক হওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না, বাধ্য হয়েই লেখক হতে হল। ছাত্র অবস্থাতেই দেখেছি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর অনেক বইপত্র ছিল এবং এখনও প্রচুর বই প্রকাশ হচ্ছে। সে-সময় নজরুলের ওপর সেরকম কোনো বই না দেখে মন খারাপ করত। নজরুল নিয়ে ক্লাসের নোটবইয়েও মাত্র তিন-চার লাইন থাকত। যেটুকু থাকত, তাতেও ভুলভাল সব লেখা ছিল। সেই সূত্রে নজরুলের জীবনী লিখতে যাওয়া।" তিনি আরও বলেন, "আমরা বাঙালি, দুটো সম্প্রদায় একে অপরকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। আমাদের বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান লেখকদের সম্পর্কে

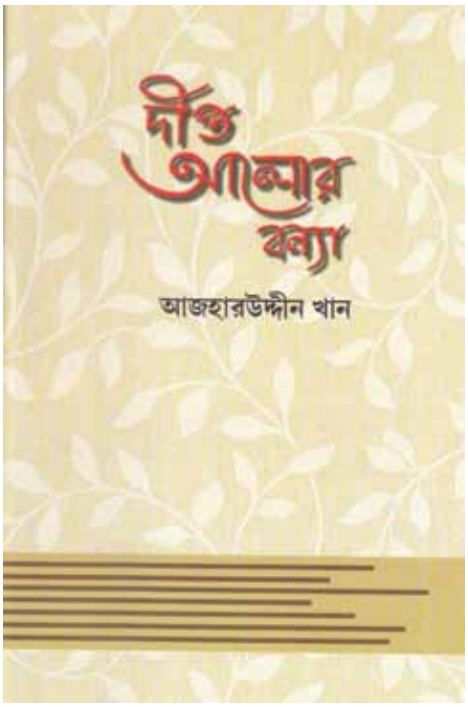

আরও বেশি আলোচনা হওয়া দরকার। উভয়ের মধ্যেকার আলাদাভাবও দূর করতে হবে।" সেইসঙ্গে তিনি এ-কথাও বলেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়কে বেশি বেশি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা করতে হবে। বিদ্যাসাগর বালিকা ভবন (হোম)-এর অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা, লেখকের সহধর্মিণী হাসনা বানু জীবনের বহু অমূল্য স্মৃতিকথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "উনি খুব কষ্ট করে সংসার নির্বাহ করেছেন। অসম্ভব মেধাবী পণ্ডিত মানুষ তিনি। তাঁর স্মরণশক্তিও প্রচুর। আমাদের বিয়ের আগেই তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' প্রকাশিত হয়।" তিনি আরও বলেন, এখনও লেখাপড়া নিয়েই তাঁর স্বামীর দিনাতিপাত হয়।

বইটির উদ্‌বোধক আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক ড. সাইফুল্লা মন্তব্য করেন, "আজহারউদ্দীন খানের 'বিলুপ্ত হৃদয়' গ্রন্থটি পড়ে তাঁকে আবিষ্কার করি।" তিনি আরও বলেন, "তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি, তিনি গবেষণার উপকরণ অর্থাৎ বইপত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভোরেই মেদিনীপুর থেকে লোকাল ট্রেন ধরতেন এবং ফিরতেন রাতে। আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য আছে এবং এটির মুক্তির পথ দেখিয়েছেন তিনি। তাঁর সমস্ত বই অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা এই প্রভেদ থেকে মুক্ত হতে পারি।" গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান পর্বের সভাপতি এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. শচীনন্দন সাউ বলেন, "জ্ঞানসাধনায় হিমালয়-সমান উঁচু হয়েও একজন মানুষ কত সহজ সরল হতে পারেন, তার উজ্জ্বল উদাহরণ আজহারউদ্দীন খান। শিক্ষক দিবসের পবিত্র দিনে আল-আমীন মিশনের শাখায় তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান আমাদের সকলের মনের মণিকোঠায় বিরাজ করবে।"

ভূতপূর্ব শিক্ষক ও গবেষক অশোক পাল তাঁর আবেগঘন স্বরে আজহারউদ্দীন খানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, "প্রায় দু-বছর ধরে এই কাজটি করেছি, কারণ,যে-গ্রন্থ ঢাকা বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছে, সেটির ভারতীয় সংস্করণ এটি। সবসময় মনে হত, আমরা সেই মান ধরে রাখতে পারব কি না। আজহারউদ্দীনদার সেটি পছন্দ হবে তো!" লেখককে উদ্দেশ করে তিনি জানান, "আপনি বইটি দেখে যেতে পারবেন এবং আপনার উপস্থিতিতে সেটি প্রকাশ হোক এটিই আমার ইচ্ছা ছিল।" তিনি আল-আমীন মিশনের প্রাণপুরুষ এম নুরুল ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তাঁর উৎসাহেই মিশনের মেদিনীপুর শাখায় এই অনুষ্ঠান হওয়ায় আমরা অত্যন্ত খুশি। সেখ মোমিনুর রহমান শিক্ষক দিবসের গুরুত্ব প্রসঙ্গে মিশন পরিবারের ভালোবাসার বন্ধনের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আল-আমীন শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, প্রতিষ্ঠানের বাইরেও বাবা ও ছেলে-মেয়েদের মধ্যেকার নানা সমস্যা দরদ দিয়ে সমাধান করে আল-আমীনে ফিরিয়ে আনা হয় হামেশাই।

প্রাবন্ধিক একরামুল হক শেখ সাহিত্যিক আজহারউদ্দীন খানের বইপত্রের উল্লেখ করে বলেন, "তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' এক অতুনীয় প্রচেষ্টা, কারণ, এটিই নজরুলের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনকথা।" তিনি মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নরুল ইসলামের উল্লেখ করে বলেন, মিশনের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনসংগ্রামের সাফল্যে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি মেদিনীপুর শহরের শিক্ষাবিদদের কথা বলতে গিয়ে শিক্ষাবিদ ও হুগলি কলেজের অ্যাংলো-আরবির অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী (১৮৩২-১৮৮৫), যাঁকে 'বাহার-উল-উলুম' অর্থাৎ বিদ্যাসাগর বলা হত, তাঁর বিষয়ে অলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন, এই পরিবারেরই স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী (১৮৮৪-১৯৪৬) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান উপাচার্য।

বালক ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠানের ২৪-তম দেওয়াল পত্রিকা 'মেদিনী'র বিদ্যাসাগর সংখ্যা উদ্‌বোধন করেন সাহিত্যসাধক আজহারউদ্দীন খান। উল্লেখ্য, 'দীপ্ত আলোর বন্যা' ১৯৯৯ সালে বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় বইটির পুনঃপ্রকাশ জরুরি হয়ে পড়ে। যশোড়া বিদ্যাসাগর মানব বিকাশ কেন্দ্রের এই ভারতীয় সংস্করণ বইপ্রেমীদের জন্য অবশ্যই সুখবর।

এলাহিগঞ্জ বালক ক্যাম্পাস ও ধর্মা বালিকা ক্যাম্পাসের দুই পৃথক অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত

প্রধান শিক্ষক ডা. ও ডি খান, মিশনের মেদিনীপুর শাখার ইন-চার্জ সেখ মহম্মদ ইস্রাফিল, সহকারী ফরিজুদ্দিন মল্লিক ও সেখ আজিজুর রহমান, মিশন পরিবারের সদস্য জাহির আব্বাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সভাপতি মিশনের শিক্ষক সুকোমল ঘোষের সমাপ্তি বক্তব্যের মধ্য দিয়েই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর ঢল

"তোমরা এগিয়ে যাও, আদর্শ মানুষ হও, তোমাদের পরিচয়ে বাবা-মায়ের মুখ যেন উজ্জ্বল হয়।"— এ-অনুপ্রেরণা শুনিয়েছেন কলকাতার মহানাগরিক তথা রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। উপলক্ষ ছিল, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নিউটাউনে আল-আমীন মিশন ইন্সটিটিউট ফর এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিঙের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আল-আমীন মিশনে পাঠরত পড়ুয়াদের উদ্দেশে তাঁর এই আহ্বানের কারণ রাজ্যের অভাবী-মেধাবীরা মিশনের মাধ্যমে তাদের আব্বা-মায়ের স্বপ্ন পূরণ করে সমাজে তাঁদেরকে সম্মানিত করছে।

ঠিক এই সাফল্যের পরিসংখ্যানই অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আল-আমীনকে অনন্য করেছে। এবং এই কারণেই অভিভাবকরা প্রত্যেক বছর আল-আমীনে ভর্তি করতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাঁদের সন্তানদের নিয়ে হাজির হন। ২৯ সেপ্টেম্বর রাজ্যের ৫৭-টি কেন্দ্রে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেছিল ১৭ হাজার ৩৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী। এর মধ্যে ৬৫৭২ জন ছাত্রী। রাজ্যে অন্য কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পাঁচটি শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক এত সংখ্যক পরীক্ষার্থীর দ্বিতীয় নজির নেই।

বর্তমানে মিশনের ৭০-টি শাখায় প্রায় ১৭ হাজার আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী-সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী নিয়ে প্রায় ২০ হাজার সদস্য আল-আমীন মিশন পরিবারে। এঁদের সঙ্গে আছেন আরও ২২ হাজার প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী। প্রাক্তনীদের মধ্যে প্রায় ২৮০০ জন ডাক্তার, ২৭০০ জন ইঞ্জিনিয়ার, শত শত শিক্ষক, অধ্যাপক, গবেষক, প্রশাসনিক অধিকর্তা ও অন্যান্য কৃতী সন্তানদের পেয়েছে সমাজ, যাঁরা মিশনের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠেছেন।

মিশনের মূল ক্যাম্পাস খলতপুর পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ তিনি বলেন, বছর বছর চলা আমাদের এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সতর্কতা ও নিপুণতা পালন করা হয়। এই পরীক্ষায় পড়ুয়াদের মেধা নিরূপণই একমাত্র বিচার্য। রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক গ্রাম ও শহরের সংখ্যালঘু মেধাবী ছেলে-মেয়েদের একত্রিত করে সঠিক পরিচর্যা ও বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত করাই আমাদের কাজ। আমরা তিন দশক ধরেই সেই কাজটি করে চলেছি। তিনি আরও বলেন, অভাবী-মেধাবীদের জন্য আল-আমীন আগেও ছিল এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌। দুঃস্থ, এতিম ও প্রান্তিক পরিবারের মেধাবীদের পড়াশোনার জন্য অর্থ কোনো অন্তরায় নয়। বরাবরের মতো তাদের পাশে থাকবে মিশন।

উপস্থিত অভিভাবকদের উদ্দেশে তিনি জানান, নতুন বছরে নিউটাউনে আল-আমীন মিশন ইন্সটিটিউট ফর এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিঙের বিল্ডিং নির্মাণ শুরু হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক ছাড়াও মিশন এতদিন ধরে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডব্লিউ.বি.সি.এস. পরীক্ষার কোচিং দিয়ে এসেছে। ফলস্বরূপ কয়েক হাজার সংখ্যালঘু ছেলে-মেয়ে চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, অফিসার হতে পেরেছে। এ ছাড়াও মিশনের প্রচেষ্টায় সংখ্যালঘু ছেলে-মেয়েদের মধ্যে, বিশেষ করে বিজ্ঞানের গবেষণা করার সুযোগ বেড়েছে। বিল্ডিং নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে এই ক্যাম্পাসে গবেষণা ছাড়াও মেডিকেলের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশনের কোচিং দেওয়া হবে। এখানে থাকবে আই.আই.টি., আই.আই.এম., ক্যাট, ম্যাট, ডব্লিউ.বি.সি.এস., আই.পি.এস., আই.এ.এস. তথা ইউ.পি.এস.সি.-র বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার আবাসিক প্রশিক্ষণকেন্দ্র। সেইসঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ট্রেনিঙের ব্যবস্থা, আর থাকবে শিক্ষা ও সমাজবিজ্ঞান নিয়ে নানান বিষয়ে গবেষণার সুযোগ। আগামী দিনে এটাই হবে আল-আমীনের প্রধান কেন্দ্র— সেন্টার অফ এক্সেলেন্স।

হাসনেচা শাখায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আল-আমীন মিশন একাডেমী, হাসনেচা ক্যাম্পাসে ২৬ জুন ২০১৯ সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয় মিশনের ছাত্র সাহিন মণ্ডলের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। কেরাত ও ইসলামি সংগীত প্রতিযোগিতা ছাড়াও মিলাদ-উন-নবি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মহ. ইলিয়াস। নবীনবরণ ও রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা উদ্‌যাপিত হওয়ার পাশাপাশি দেওয়াল পত্রিকা 'কুঁড়ি' উন্মোচিত হয়। আবৃত্তি, সংগীত ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার পরে অভিনব কুইজ সকলের মনকে আকৃষ্ট করে। ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত নাটক 'অন্ধকার থেকে আলোয়' সবার অভিনন্দন কুড়োয় । অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের মধ্যে আল-আমীন সেন্টার ফর এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (AACERT)-এর গিয়াসউদ্দিন মণ্ডল, হাসনেচা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌতম পাল রবীন্দ্র-নজরুল প্রাসঙ্গিতার ওপর আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মিশনের শিক্ষক তৌফিক আলম। কমিটির পক্ষ থেকে অ্যাডভোকেট জনাব শাহনওয়াজ মণ্ডল শুভেচ্ছাবার্তা প্রদান করেন। এই শাখার সুপারিন্টেনডেন্ট রাজিবুর রহমান সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জীবনপুর শাখায় অনুষ্ঠান

উত্তর চব্বিশ পরগনায় জীবনপুর শাখার আল-আমীন একাডেমীর উদ্যোগে সম্প্রতি সারাদিন মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। বক্তব্য রাখেন আবৃত্তিশিল্পী

অগ্নিবীণা, সম্পাদক রবীন মুখার্জী, সাংবাদিক সাহিত্য ও সমাজকর্মী আব্দুল কায়ুম, বাচিকশিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অজন্তা ত্রিপাঠী এবং শিক্ষক ও 'শব্দশহর'-সম্পাদক আবেদীন হক আদি, মিশনের সুপারিন্টেনডেন্ট সেখ নিজামুদ্দিন, শিক্ষক জাহিরুল আমীন প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষাভাবনা ও সমাজদর্শনের ওপর বক্তারা বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি এই মিশনের শুভকামনা করে সমাজ গঠনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তাও দেন।

রবীন্দ্র-নজরুল দিবস পালন ও নবীনবরণে, আবৃত্তি, ক্যুইজ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, সংগীত প্রতিযোগিতা হয়। ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত সামাজিক নাটক 'রক্তের মূল্য', যা খুবই প্রশংসার দাবি রাখে। অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ ও নৈশভোজের ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন শিক্ষক জাহিরুল আমীন।

দেশের সেরা ৩০ শিক্ষকের অন্যতম

গত শতকের নয়ের দশকের হাওড়ায় খলতপুরের অতি ক্ষুদ্র এক চারা গাছ আজ এক মহিরুহ আল-আমীন মিশনে পরিণত। দেশভাগ তথা বাংলাভাগ ও নানা ঐতিহাসিক কারণে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সমাজের, মুখ্যত গ্রামীণ ও প্রান্তিক গোষ্ঠী সার্বিকভাবে, বিশেষ করে শিক্ষায় ছিল একেবারে পেছনের সারিতে। সেই অবস্থা ও অবস্থান থেকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সে-সময় কেউ কেউ নানা পন্থায় নিয়োজিত ছিলেন। সেই তালিকায়

খলতপুরের ভূমিপুত্র এম নুরুল ইসলাম ও তাঁর সহযোগীবৃন্দও উদ্যোগী হন। তবে অন্যান্যদের সঙ্গে নরুল ইসলামদের সুনির্দিষ্ট ও পরিষ্কার এক পার্থক্য ছিল পরিকল্পনা ও দূরদৃষ্টিতে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা মেধাবীদের ঘরোয়া পরিবেশে মেধার লালনপালন। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন, একমাত্র এই পথেই দেশ রাজ্য ও সমাজ সেবার সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায়ের অগ্রগতিও সম্ভব।

আল-আমীনের এই সাফল্যের সুগন্ধ রাজ্য ছাড়িয়ে অন্য রাজ্যেও পৌঁছেছে। ১৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় উদ্ভাবন ও উদ্যোগে উৎসাহদানকারী প্রখ্যাত সংস্থা আইবি হাব (IB Hub) দেশের ৩০ জন সুপার শিক্ষককে (IB Hubs Super 30) তেলেঙ্গানা রাজ্যের হায়দরাবাদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার (HICC)-এ সম্মানিত করেছেন। উল্লেখ্য, ৩০ হাজারের বেশি প্রাথমিক নমিনেশন থেকে নির্বাচন করা হয়েছে ৩০ জনকে। দেশের সেরা, অর্থাৎ তাঁদের ভাষায় 'সুপার ৩০' জনের মধ্যে আছেন আল-আমীন মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলামও। ঘোষকের কণ্ঠে তাঁর নাম ঘোষণা হতেই গোটা হল করতালিতে

৩০ হাজারের বেশি নমিনেশন থেকে নির্বাচন করা হয়েছে ৩০ জনকে। দেশের সেরা, অর্থাৎ 'সুপার ৩০' জনের মধ্যে আছেন আল-আমীন মিশনের সম্পাদক এম নুরুল ইসলামও। ঘোষকের কণ্ঠে তাঁর নাম ঘোষণা হতেই গোটা হল করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

মুখরিত হয়ে ওঠে। একদিকে চলে আল-আমীন মিশনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও সাফল্যের ঘোষণা এবং তারই সমানতালে পেছনের জায়ান্টস্ক্রিনে ভেসে ওঠে মিশন ও নুরুল ইসলামের ছবি ও তথ্যাবলি। ঘোষকের শেষ বাক্য ছিল, তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে পিতা-সম আচরণ করেন এবং স্বপ্নদর্শী হিসেবে তাদের করেন অনুপ্রাণিত। তাঁকে শাল পরিয়ে মঞ্চে অভ্যর্থনা জানানোর পর সুপার শিক্ষকের মেডেল গলায় ঝুলিয়ে দেন আইবি হাবস-এর গ্রুপ-উপদেষ্টা সঞ্জীব আয়ার। একে একে তাঁর হাতে মেমেন্টো ও শংসাপত্র তুলে দেন তিনি। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ৩০ জন সুপার শিক্ষক ছাড়াও বহু বিশিষ্টজন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আইবি হাবস-এর চিফ প্রমোটর ও মেন্টর এস বিজয় কুমার উপস্থিত সুপার শিক্ষক ও অতিথিবর্গকে স্বাগত জানিয়ে, তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান। ভবিষ্যতে তাঁদের সংস্থা আরও বেশি বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সম্মানিত করবে বলেও তিনি ঘোষণা করেন।

সংক্ষিপ্ত এক প্রতিক্রিয়ায় আইবি হাবস-কে ধন্যবাদ জানিয়ে এম নুরুল ইসলাম বলেন, "এই সম্মানপ্রাপ্তি আমার জন্য এক স্মরণীয় ঘটনা এবং এর স্মৃতি সারাজীবন মনে থাকবে।" তিনি আরও জানান, এই কৃতিত্ব তাঁর প্রিয় শিক্ষার্থী ও সহকর্মীদের এবং তিনি তাদের কাছে ঋণী। তাদের ছাড়া তাঁর পক্ষে এই কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না বলেও উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, এর আগে ২০৭ সালে livemint.com নামের প্রখ্যাত হিন্দুস্থান টাইমস গ্রুপের এক অনলাইন পত্রিকায় 'সিক্সটি ইন সিক্সটি' সিরিজের ৬০ জন, যাঁরা প্রচারের আলোয় না এসেও সমাজ ও দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের নিয়ে এক সিরিজ প্রকাশ করে। সেই সিরিজে এম নুরুল ইসলাম নিয়ে লেখা হয়, "In West Bengal, one man's on a mission to educate Muslim kids" ২০১৫ সালে আল-আমীন

মিশনকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'বঙ্গভূষণ পুরস্কার'-এ সম্মানিত করেন। এ ছাড়া ২০০২-এ এককভাবে ও ২০০৯ সালে সাউথ পয়েন্ট স্কুলের সঙ্গে যৌথভাবে আল-আমীন মিশন 'দ্য টেলিগ্রাফ স্কুল অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স' অর্জন করে। ২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের পক্ষে আল-আমীন মিশনকে 'বেগম রোকেয়া পুরস্কার' প্রদান করা হয়।

এম নুরুল ইসলামের সম্মাননা প্রাপ্তির খবরে মিশনের প্রাক্তনী-সহ হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল উর্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ও গবেষক বাঙালি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খুশির বার্তা ছড়িয়ে পড়ে। হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে তাঁকে ২০ অক্টোবর বিকেলে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ইউনিয়নের তরফেও তাঁকে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০ জন গবেষক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান শিক্ষকের অবসর গ্রহণ

আসণ্ডা আদর্শ শিক্ষা সদন থেকে শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে কর্মজীবনের এক দীর্ঘ সময়কাল নিজেরই প্রতিষ্ঠিত খলতপুর হাই মাদ্রাসা (উচ্চ-মাধ্যমিক)-য় প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে সামলেছেন। তিনি আল-আমীন মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং খলতপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক এম নুরুল ইসলাম। ৩১ অক্টোবর ২০১৯ ছিল খলতপুর হাই মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষকজীবনের শেষদিন। বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক ও সদস্যদের উপস্থিতিতে বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয় ওই দিন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মাদ্রাসার নব নির্মিত অডিটোরিয়ামের উদ্‌বোধন করেন উদয়নারায়ণপুরের বিধায়ক ও খলতপুর হাই মাদ্রাসার সম্পাদক সমীরকুমার পাঁজা। সঙ্গে ছিলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রাক্তন বিধায়ক ননীগোপাল চৌধুরী। উল্লেখ্য, বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠান এই অডিটোরিয়ামেই অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বিধায়ক তথা মাদ্রাসার সম্পাদক তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, তাঁর বিধানসভা এলাকায় এই একটিই মাত্র হাই মাদ্রাসা এবং এটি একটি ব্যতিক্রমী মাদ্রাসা হওয়ায় তিনি খুবই গর্বিত। তিনি আরও জানান যে, মূলত নুরুল সাহেব, মারুফ সাহেব এবং হাসেম সাহেব— এই তিন জনের অনুরোধেই তিনি এই মাদ্রাসার সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে রাজি হন এবং এই মাদ্রাসার রূপকার হিসেবে তিনি নুরুল ইসলামকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান। মাদ্রাসার সহকর্মী থেকে সম্পাদক, প্রাক্তন বিধায়ক, শুভানুধ্যায়ী, ছাত্র-ছাত্রীরা একে একে প্রধান শিক্ষকের হাতে তাঁদের ভালোবাসা-মাখানো উপহার তুলে দেন। অনেকেই তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন এবং মাদ্রাসার উন্নয়নে প্রধান শিক্ষকের দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের তরফে এক অভিজ্ঞানপত্র তুলে দেওয়া হয় প্রধান শিক্ষকের হাতে। এই পত্রে লেখা হয়— "নিয়মানুযায়ী আজ আমাদের প্রধান শিক্ষকরূপে আপনার কর্মজীবনের শেষদিন। এমন দিনে আপনাকে আমরা বিষণ্ণহৃদয়ে বিদায় জানাচ্ছি একটিই সান্ত্বনায় যে, আপনার অফুরন্ত সময় এবার ব্যয়িত হবে রাজ্য ছাড়িয়ে সমগ্র দেশের পিছিয়ে পড়া সমাজের কাজে।"

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় সহযোগী ব্যক্তিবর্গ ও জমিদাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং প্রয়াতদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে এম নুরুল ইসলাম তাঁর বিদায়সম্ভাষণ শুরু করেন। তিনি শুরুতেই স্মরণ করেন প্রয়াত শেখ মহম্মদ হানিফ সাহেবকে, যিনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ভাবনা ভেবেছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন প্রাক্তন বিধায়ক ও সেই সময়ে মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি ননীগোপাল চৌধুরীর প্রতি, যিনি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। মাদ্রাসার বর্তমান সম্পাদক সমীরকুমার পাঁজা এবং ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুল হাসেম মল্লিক-সহ উপস্থিত সবাইকে তিনি শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানান। তিনি বলেন, তাঁর জীবনের চতুর্থ অধ্যায় শুরু হতে চলেছে আগামীকাল, কারণ, তিনি তিন কুড়ি পেরিয়ে গেছেন। ফেলে আসা ষাট বছরে রাজ্য ও দেশ জুড়ে যে ভালোবাসা-উষ্ণতা পেয়েছেন, সেসবই পরের অধ্যায়কে এগিয়ে নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্। তাঁর মতে, আমরা যদি আমাদের কাজের সঙ্গে ভ্যালু যোগ করি তাহলে সেটির দ্বারা সমাজ ও সম্প্রদায় উপকৃত হয়। আমরা প্রত্যেকেই যে-যে কাজের জন্য পৃথিবীতে এসেছি, সেসব কাজ ভালোবেসে মহান স্রষ্টার উদ্দেশে করতে হবে। বিদায়ের এই ক্ষণে অনেকেরই মন বিষণ্ণ হলেও তাঁর আনন্দ হচ্ছে। কারণ, আল-আমীন মিশন নিয়ে তিনি কাজে ডুবে থাকতে পারবেন। বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকদেরও তিনি কৃতজ্ঞতা জানান, কারণ, উভয়েরই পরামর্শ তাঁর এগিয়ে যেতে সহায়ক হয়েছে।

৩১ অক্টোবর ২০১৯ ছিল খলতপুর হাই মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষকজীবনের শেষদিন। বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক ও সদস্যদের উপস্থিতিতে বিদায়-সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয় ওই দিন।

ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক এম আব্দুল হাসেম তাঁর বক্তৃতায় তাঁদের প্রিয় প্রধান শিক্ষকের পরামর্শ ও সক্রিয়তা ভবিষ্যতেও পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এডিআই বনমালী জানা, বিডিও রামজীবন হাঁসদা, মাদ্রাসার শিক্ষক ও আল-আমীন মিশনের সুপারভাইজার সেখ মারুফ আজম-সহ আল-আমীন পরিবারের সদস্য, মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, প্রাক্তনী ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী এবং বহু শুভানুধ্যায়ী। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকামনায় মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে মাদ্রাসার আরবি শিক্ষক মহ. নাজমুল আলমের দোওয়া ও প্রার্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান অ্যাওয়ার্ড

আমেরিকান ফেডারেশন অব মুসলিমস অফ ইন্ডিয়ান অরিজিন (আফমি)-এর প্রদত্ত স্যার সৈয়দ আহমদ খান অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হলেন আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ ওড়িশার ভুবনেশ্বরের রেলওয়ে অডিটোরিয়ামে আফমির ২৮-তম ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন এডুকেশন অ্যান্ড গালা অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামে মর্যাদাকর এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। সহর্ষ করতালির মধ্যে এম নুরুল ইসলামের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আফমির সভাপতি সিরাজ ঠাকোর, প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. এ এস নাকাদার, ডা. আকবর মোহাম্মেদ, ডা. হুসেন এফ নাগামিয়া প্রমুখ।

পুরস্কার-প্রাপ্তির পর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, "আমেরিকান ফেডারেশন অব মুসলিমস অফ ইন্ডিয়ান অরিজিন আমাকে স্যার সৈয়দ আহমদ খান অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করার জন্য তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই পুরস্কার পেয়ে আমি ভীষণ সম্মানিত বোধ করছি। আমি বিশ্বাস করি, এই পুরস্কার আমার সহকর্মীদের জন্য, যাঁরা আল-আমীন মিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য তাঁদের জীবনটাই উৎসর্গ করেছেন। তাঁদেরকে পাশে না পেলে আমরা এত দূর পৌঁছোতে পারতাম না।

আমরা যখন পথ চলা শুরু করি, আমাদের সামনে তখন ছিল বেশ কয়েকটি মডেল। তারা ছিল আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক। রামকৃষ্ণ মিশন অবশ্যই আমাদের পথ দেখিয়েছিল এবং আমাদের মনোবলকে সমৃদ্ধ করেছিল বেঙ্গালুরুর আল-আমীন এডুকেশন সোসাইটি। একইসাথে আমরা আলিগড় আন্দোলন এবং তার প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খান দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলাম। তিনি ছিলেন সমাজসংস্কারবাদী, ইতিহাসবিদ, দার্শনিক ও দূরদর্শী শিক্ষাব্রতী, যিনি অবিভক্ত ভারতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তদুপরি, তিনি প্রথম দিকের অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, যাঁরা দরিদ্র পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করেছিলেন।

প্রায় সাড়ে তিন দশকের আল-আমীন মিশন এখন একটি বড়ো পরিবারে পরিণত। ১৭ হাজার আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী, ২৩ হাজার প্রাক্তনী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা-সহ প্রায় তিন হাজার কর্মচারীর ভরসাস্থল এই বৃহৎ পরিবার। ৩০০০ জন ডাক্তার, ২৮০০ জন ইঞ্জিনিয়ার-সহ উচ্চস্তরীয় বিজ্ঞানগবেষক, ডব্লিউ.বি.সি.এস. অফিসার, প্রফেসর, সরকারি কর্মচারী, উদ্যোগপতি, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও দেশ-বিদেশে কর্মরত নানা পেশার এই পরিবারের হাজার হাজার প্রাক্তনী। প্রতি বছর সফল শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক হাজারের চেয়ে কম নয়।"

উল্লেখ্য, আমেরিকান ফেডারেশন অব মুসলিমস অফ ইন্ডিয়ান অরিজিন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলমান আমেরিকানদের দ্বারা পরিচালিত একটি লোকহিত, পরিষেবা এবং ইস্যু-ভিত্তিক সংগঠন। এটি ১৯৮৯ সালে উত্তর আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ভারতীয় মুসলমান সংখ্যালঘুদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের লক্ষ্যে এই সংগঠন অবিচল থেকেছে। আমেরিকান এবং ভারতীয় ত্রাণ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সহযোগিতা কামনা করে ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে তিন দশক ধরে কাজ করছে এই প্রতিষ্ঠান।

দু-দিনের এই অনুষ্ঠানে দেশ ও সমাজ নিয়ে নানান বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। দেশ-বিদেশের প্রতিনিধি ছাড়াও এতে অংশগ্রহণ করেন শিক্ষাবিদ, উদ্যোগপতি, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সমাজকর্মী প্রমুখ। সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও আল-আমীন মিশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আল-আমীন মিশন স্টাডি সার্কলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'দ্য ওয়ার'-এর প্রখ্যাত সাংবাদিক আরফা খানুম শেরওয়ানি, বিধায়ক মুহাম্মদ মুকিম, মুসলিম ওমেন অর্গানাইজেশনের সম্পাদিকা মাহমুদা মাজিদ, প্রাক্তন বিধায়ক মহ. আয়ুব খান প্রমুখ।

ওয়াইজ শিক্ষা সম্মেলনে এম নুরুল ইসলাম ও দিলদার হোসেন

পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় শিক্ষাপদ্ধতির পুনর্মূল্যায়নের বৈশ্বিক আহ্বানের মাধ্যমে শেষ হল ওয়ার্ল্ড ইনোভেশন সামিট ফর এডুকেশন (WISE) আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলন। গুরুত্বপূর্ণ এই সম্মেলনে এ-বছরের থিম 'Unlearn, Relearn: What it means to be Human' নিয়ে দারুণ উপভোগ্য আলোচনা করেন প্রতিনিধিগণ। ১৯ থেকে ২১ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত কাতারের রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠিত এই শিক্ষাসম্মেলনে আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম প্রতিনিধি ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন আল-আমীন মিশন স্টাডি সার্কলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেন।

শিক্ষায় অসামান্য অবদানের জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়াগোর আমেরিকান পাবলিক চার্টার স্কুলগুলির নেটওয়ার্ক হাই টেক হাই (HIH)-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ল্যারি রোজনস্টকের হাতে মর্যাদাপূর্ণ ওয়াইজ প্রাইজ ফর এডুকেশন উদ্‌বোধনী অধিবেশনে তুলে দেন কাতার ফাউন্ডেশনের

চেয়ারপার্সন শেইখা মোজা বিন্‌ত নাসের। ল্যারি রোজনস্টক তাঁর উদ্ভাবনী শিক্ষা-মডেলের মাধ্যমে সব ধরনের আর্থসামাজিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের উন্নত মানের শিক্ষায় সাফল্যে সহায়তা করে চলেছেন। উদ্‌বোধনী পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে শতাধিক দেশের প্রায় তিন হাজারেরও বেশি অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। তিন দিনের এই সম্মেলনে প্রায় ৯০০ জন শিক্ষার্থী-সহ ৩৫০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হন। বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী, নীতিনির্ধারক, গবেষক, চিন্তক, বুদ্ধিজীবী, আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিদ-সহ বহু বিশিষ্ট জনের আলাপ-আলোচনায়, তর্কে-বিতর্কে সম্মেলন খুবই সফল। ল্যারি রোজনস্টক 'শিক্ষা-উদ্দেশ্যের পুনরাবিষ্কার' শীর্ষনামের সম্বোধনে ছেলেমেয়েদের শেখানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, "আমাদের বাচ্চাদের আমাদের দরকার। তাদের সহায়তা করা আমাদের জন্য জরুরি। তাদের কৌতূহল ও ভাব-ভাবনা আমাদের শুনতে হবে। একসাথেই এটি আমাদের করা দরকার।"

সমাপ্তি অধিবেশনের সঞ্চালক ছিলেন বিবিসি-র আন্তর্জাতিক প্রতিবেদক ইয়ালদা হাকিম। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিকের ফিউচারিস্ট জেসন সিলভা, রক অ্যান্ড রোল ফরএভার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা স্টিভন ভ্যান জ্যান্ডট, কবি ও ইউএন শুভেচ্ছাদূত এমটিথাল মাহমুদ, ওয়াইজ-সিইও স্টাভ্রস এন ইয়াননোকা প্রমুখ বক্তৃতা করেন। ইয়াননোকা বলেন, "এক শিক্ষিত দুনিয়া স্বাস্থ্যকর, আরও সমৃদ্ধশালী, আরও শান্তিকামী ও সুন্দর এক বিশ্ব। কাউকে পেছনে রাখতে আমরা পারি না।" তিনি আরও বলেন, "আমরা এমন কর্মসূচি চালু রাখতে চাই, যা শিক্ষায় উদ্ভাবন এবং শিক্ষা উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবকদের ক্ষমতায়ন উদ্‌যাপন করে। ওয়াইজ একাধিক স্তরে এগুলির চলমান কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে চায়। আমরা এমন গবেষণায় নিয়োজিত থাকি, যা নীতি ও অনুশীলনকে অবহিত করে।" তিনি ঘোষণা করেন, পরবর্তী ওয়াইজ ২০২০ মে মাসে কলম্বিয়ার বোগোটা ও মেডেলেনে অনুষ্ঠিত হবে। কাতার ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন শেইখা মোজা বিন্‌ত নাসেরের নেতৃত্বে ২০০৯ সালে ওয়াইজ গঠিত হয়। সৃজনশীল চিন্তাভাবনা, বিতর্ক এবং নির্দিষ্ট পদক্ষেপের এটি এক আন্তর্জাতিক বহুমুখী প্ল্যাটফর্ম। শিক্ষার নতুন পদ্ধতির ক্ষেত্রে নিজেকে বিশ্বব্যাপী রেফারেন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে ওয়াইজ।

আল-আমীন মিশনও প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই শিক্ষা, বিশেষ করে প্রান্তিক ও সুযোগ-সুবিধাহীন পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের চর্চায় মগ্ন। বর্তমান সময়ের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভরা পেশাদারি ও উচ্চতর শিক্ষায় কীভাবে মনুষ্যত্বের সাফল্য সুনিশ্চিত হয়, সে-বিষয়েও থাকে সজাগ। সে-কারণে দেশ ও বিদেশের নানান শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার, আলোচনাচক্র, কর্মশালা এবং সম্মেলনে মিশনের প্রতিনিধিরা নিয়মিত উপস্থিত হন। কাতার থেকে ফিরে এম নুরুল ইসলাম তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে শোনালেন, "ওয়াইজ সম্মেলনে বহু শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে মত বিনিময় ও পারস্পরিক আলোচনায় বহু নতুন বিষয় ও উদ্ভাবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। তাঁদের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের প্রতিষ্ঠানে নিজেদের মতো করে সেসব প্রয়োগ করলে আল-আমীন মিশনও উপকৃত হতে পারে।" তিনি আরও বলেন, দেশ থেকে দূরের এই আরব দেশেও সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় আল-আমীনের বেশ কিছু কর্মরত সফল প্রাক্তনীকে দেখে মন ভরে যায়। উল্লেখ্য, গত ২০১৭-র ১৪ থেকে ১৬ নভেম্বর দোহায় অনুষ্ঠিত ওয়াইজ সম্মেলনে আল-আমীন মিশন প্রথম বার যোগদান করে। ■

আল-আমীন বার্তা

দেখে পড়ার ▮ পড়ে দেখার

আল-আমীন মিশন

একটি পরিবার। এই পরিবারের সদস্য আপনিও।

পরিবারের মুখপত্র

আল-আমীন বার্তা

নিজে পড়ুন। অন্যকে পড়ান

তিনি চতুর্থ বাঙালি। পৃথিবীর সর্বোচ্চ সম্মান নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। দারিদ্র্য দূরীকরণে লাগাতার মৌলিক গবেষণা তাঁকে, তাঁর সহকর্মী ও স্ত্রী এস্থার দুফলো এবং মাইকেল ক্রেমারকে এনে দিয়েছে অর্থনীতিতে নোবেল। কেমন তাঁর গবেষণা? এ-সংখ্যায় রইল তাঁর অমূল্য কাজের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি।

চতুর্থ বাঙালি

পল্লব সরকার

২০১৯-এ অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির আত্মাসংকুচিত কূপমণ্ডুক জীবনে যেন এসে লেগেছে এক আন্তর্জাতিকতার বাতাস। যে তিনজন এ-বছর এই সম্মান পেলেন তাঁদের অন্যতম এই বাংলারই মানুষ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। অপর দু-জন তাঁরই সহকর্মী। একজন তাঁর স্ত্রী, অধ্যাপিকা এস্থার দুফলো এবং অন্যজন অধ্যাপক মাইকেল ক্রেমার। এর আগে ১৯৯৮ সালে এই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন বিশ্ববন্দিত বাঙালি অমর্ত্য সেন। খুব সংক্ষেপে বললে, তাঁদের কাজের ক্ষেত্র হল 'উন্নয়নমূলক অর্থনীতি' বা 'ডেভলপমেন্টাল ইকনমিক্স'।

১৯৬১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বোম্বে (অধুনা মুম্বাই)-তে অভিজিতের জন্ম। মা-বাবা দু-জনেই অর্থনীতির অধ্যাপক। মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় (পাটানকর) মরাঠি কন্যা। পড়িয়েছেন কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোসাল সাইন্সে। পিতা দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের কিংবদন্তিসম অধ্যাপক। কলকাতার সাউথ পয়েন্ট স্কুলে কেটেছে অভিজিতের স্কুলবেলা। তীক্ষ্ণ মেধাবী এই ছাত্রের হাতের লেখাটি কিন্তু মোটেও ভালো ছিল না। সে-জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে তাঁকে গঞ্জনাও শুনতে হয়েছে। অভিজিতের কলেজ কলকাতার প্রেসিডেন্সি। ১৯৮১ সালে তিনি সেখান থেকে বি.এসসি. পাস করেন। অঙ্ক প্রিয় বিষয় হলেও সাহিত্য এবং সংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল

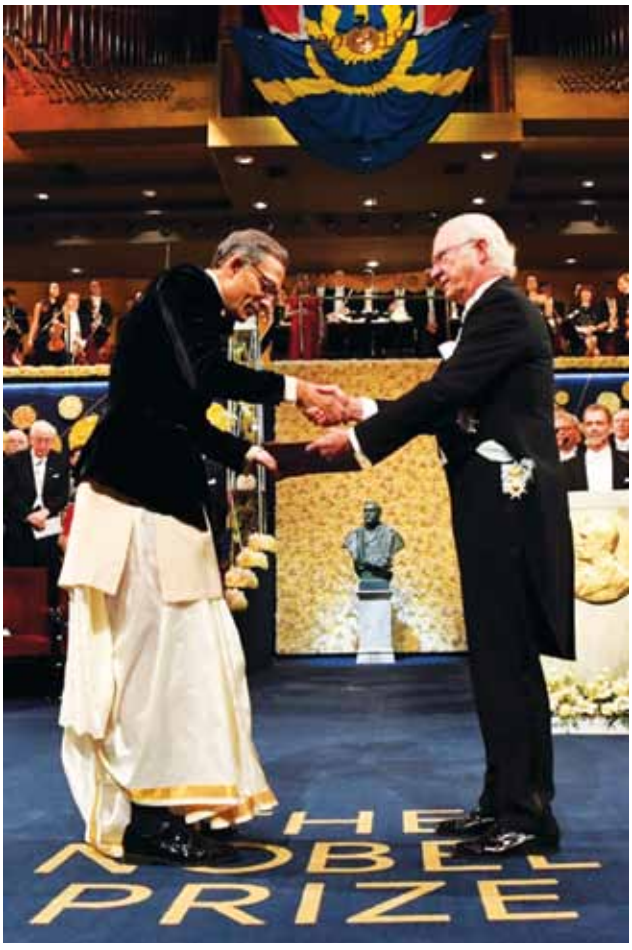

নোবেল পুরস্কার অর্পণ।

অত্যন্ত প্রবল, হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও যা কখনো মুছে যায়নি। এখনও তিনি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরিকল্পনা করেন সিনেমা বানাবার।

কলেজের পাঠ শেষ করে তিনি যোগ দেন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ)-এ। এই সময় ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ঘেরাও আন্দোলনের অভিযোগে দশ দিন তিনি দিল্লির তিহাড় জেলে বন্দিও ছিলেন। এই ঘটনা থেকে এ-কথা স্পষ্ট যে, 'ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ'-র 'অধ্যয়নং' কখনোই তাঁর কাছে কেবল সিলেবাসের বই পড়া ছিল না। যে-মানুষ ভবিষ্যতে প্রচলিত ধারণা ছিঁড়েখুঁড়ে নতুন ভাবনার জন্ম দেবেন, তাঁর কাছে অধ্যয়ন শব্দটির যে বহুমাত্রিক দ্যোতনা থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। সমাজে এরকম মানুষরাই হন ভবিষ্যতের ভগীরথ। এঁরাই সৃষ্টি করেন এমন কিছু, যা পৃথিবীকে খানিকটা এগিয়ে দেয়। পরবর্তী সময় পৃথিবী তারই স্বীকৃতি দেয় নানান পুরস্কারের মাধ্যমে। অভিজিতের সৃষ্টিশীল জীবনের গোড়া বাঁধা শুরু হয়েছিল এভাবেই।

জেএনইউ থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. ডিগ্রি (১৯৮৩) লাভ করে তিনি গবেষণার কাজে পাড়ি দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে 'Essays in Information Economics' সন্দর্ভের জন্য পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন (১৯৮৮)। অভিজিৎ বর্তমানে মার্কিন নাগরিক এবং ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি)-র অর্থনীতির অধ্যাপক। এ ছাড়া পড়িয়েছেন হার্ভার্ড এবং প্রিন্সটোন বিশ্ববিদ্যালয়েও।

অভিজিতের নোবেল প্রাপ্তির বিষদ আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা দেখে নিই, অর্থনীতির নীতি কীভাবে আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। মিড-ডে মিলের পাতে ডিম পড়বে না বিস্বাদ সোয়াবিনের তরকারি, মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেটা কলেজ পাস করে সম্মানজনক কাজ পাবে কি না, পেটোয়া ব্যবসায়ীদের হাতে বিপুল সম্পদশালী সরকারি সংস্থা তুলে দেওয়া হবে কি না— এই সবকিছুই নির্ধারিত হয় দেশের ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের দ্বারা। তাঁরা সিদ্ধান্তগুলি নেন অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী। এই দৃষ্টিভঙ্গি আবার প্রভাবিত হয় অর্থনীতির নানান তত্ত্ব দ্বারা। অর্থাৎ, ভিক্ষুক থেকে বিলিয়নেয়ার— সকলেই অর্থনীতির অক্ষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

বিশ্ব-অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য দারিদ্র্যমোচন। দশকের পর দশক এই লক্ষ্যে বহু টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। সেই টাকা কীভাবে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হবে, সে-বিষয়ে অর্থনীতিবিদেরা নানান তত্ত্ব দিয়ে এসেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এর পরেও দারিদ্র্যের করাল গ্রাস থেকে পৃথিবী মুক্ত নয়। যেমন, আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির দক্ষিণের দেশগুলি, দক্ষিণ এশিয়ার বহু অঞ্চল— ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের মতো তৃতীয়বিশ্বের দেশগুলি, দক্ষিণ আমেরিকার বেশ কিছু দেশ, ইত্যাদি। এইসব দেশে দারিদ্র্য এমনই প্রকট যে, বহু মানুষকে আধপেটা বা শূন্যজঠরে রাত কাটাতে হয়। চিকিৎসা-পরিষেবা তথৈবচ। শিশু-মৃত্যুর হার উদ্‌বেগজনক। শিক্ষা এবং রোজগারের অবস্থাও কহতব্য নয়। আবার যেসমস্ত দেশে দারিদ্র্য এখনও তত প্রকট নয়, সেসব দেশেও মানুষে মানুষে আর্থিক বৈষম্য ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কোন দিন যে মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবে, তা কেউ জানে না। তাই দরকার কিছুটা ক্ষোভ প্রশমনের। তার জন্য সরকার, এনজিও (অসরকারি সংস্থা) বা ধনকুবের দাতাদের দরকার দারিদ্র্যমোচনের এমন একটি অর্থনৈতিক মডেল, যা পরীক্ষামূলকভাবে সফল প্রমাণিত। কিন্তু কোন মডেল সফল আর কোনটা নয়, তা বোঝার উপায় কী? সহজ কথায়, মেপে দেখো উন্নয়নের মান। অভিজিৎ-এস্থার-ক্রেমার— এই নোবেলজয়ী ত্রয়ীর বিশ্বজোড়া খ্যাতি এই উন্নয়ন মাপবার পদ্ধতি উদ্ভাবনে। প্রায় গত বিশ বছর ধরে বিশ্বের নানা দেশ, রাজস্থান থেকে রোয়ান্ডা, ঘুরে তাঁরা গড়ে তুলছেন এই পরিমাপ-পদ্ধতির মডেল। গরিব মানুষের জীবনের একেবারে অন্দরে ঢুকে তাঁরা বুঝতে চেয়েছেন সংকটের ধরনধারণ। সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁদের পরিকল্পনায়। কেন একটি উন্নয়নপ্রকল্প সফল হয় আর কেনই-বা অন্যটি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না, তা বুঝতে গেলে যে নিবিড় অভিনিবেশে পাঠ করতে হয় মানুষের জীবনকে, তা তাঁরা করার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ, আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে নয়, রীতিমতো মাটির পৃথিবীতে নেমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তাই অভিজিৎকে কেবল নীতিজ্ঞানী অর্থনীতিবিদের গণ্ডিতে না বেঁধে বিজ্ঞানী অভিধায় ভূষিত করাই যায়। সমাজ-রূপ ল্যাবরেটরি যাঁর কর্মক্ষেত্র। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁরা অনুসরণ করেছেন যে-পদ্ধতিটি, তা চিকিৎসাগবেষণায়, বিশেষ করে নতুন ওষুধের গবেষণায়, বহুদিন ধরে সফল প্রমাণিত। পদ্ধতিটির নাম র‍্যান্ডমাইজড

বিশ্ব-অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য দারিদ্র্যমোচন। এই লক্ষ্যে বহু টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। সেই টাকা কীভাবে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হবে, সে-বিষয়ে অর্থনীতিবিদেরা নানান তত্ত্ব দিয়ে এসেছেন। দেখা যাচ্ছে এর পরেও দারিদ্র্যের করাল গ্রাস থেকে পৃথিবী মুক্ত নয়।

কন্ট্রোল ট্রায়াল বা আরসিটি। সহজ বাংলায়— বিধিবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত, সমবিভাজিত নিরীক্ষণ পদ্ধতি। কোনো ওষুধ কাজ করছে কি না বা করলেও কতটা, তার সাফল্যের মাত্রা বুঝতে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যাদের ওপর পরীক্ষা করা হবে, তাদের প্রথমে সমান দুটি দলে ভাগ করা হয়। এক দলকে দেওয়া হয় আসল ওষুধ। তারা হল টার্গেট গ্রুপ। অপর দলকে দেওয়া হয় ছদ্মওষুধ বা placebo, যার কোনো উপকারী বা ক্ষতিকারক গুণ নেই। এদের বলা হয় কন্ট্রোল গ্রুপ। দুটি দলের সকলেই অবশ্য জানেন যে, তিনি আসল ওষুধই পেয়েছেন। এরপর দুটি গ্রুপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের তুলনামূলক আলোচনা করা হয় (তথ্য বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা হয় রাশিবিজ্ঞানের জটিল গাণিতিক পদ্ধতি)। অভিজিতের দৃষ্টিতে দারিদ্র্যও একটি অসুখ। কোনো দারিদ্র্যমোচন প্রকল্প কার্যকরী হবে কি না, তা বুঝতে তাই তাঁরা একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে নির্বাচিত একটি দলের ওপর প্রয়োগ করেন কিছু কার্যক্রম এবং অপর একটি সমতুল্য দলের ওপর প্রয়োগ করেন ওই একই কার্যক্রম, সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় অতিরিক্ত কিছু সুবিধা। এই অতিরিক্ত সুবিধা কার্যক্রমটিকে তুলনামূলকভাবে অতিরিক্ত সফল করে তোলে কি না, বিচার্য সেটাই। নয়ের দশকে মাইকেল ক্রেমার কেনিয়ায় প্রথম এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তাঁর গবেষণার লক্ষ্য ছিল কৃমির ওষুধ খাইয়ে শিশুদের স্কুলে হাজিরার প্রবণতা এবং বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটানো যায় কি না, তা নির্ণয় করা। অভিজিৎ এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রথম আরসিটি প্রয়োগ করেন রাজস্থানে। সেবা মন্দির ট্রাস্ট নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে উদয়পুরের এক গ্রামে চলছিল শিশুদের টিকাকরণ। কিন্তু মানুষের অনীহায় সে-কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ার জোগাড়। অভিজিৎ পরামর্শ দিলেন— একদল শিশুর পরিবারকে বাচ্চার টিকার সঙ্গে দেওয়া হোক এক কিলো ডাল। দেখা যাক তাতে টিকাকরণে আগ্রহীর সংখ্যা বাড়ে কি না। ফল পাওয়া গেল আশাতিরিক্ত। পরিবারগুলি শিশুদের টিকাকরণ কেন্দ্রে নিয়ে আসতে ক্রমশ আগ্রহী হয়ে উঠল। বোনাসরূপী ডাল এক ধাক্কায় বহুগুণ বাড়িয়ে দিল টিকাদানের হার। উৎসাহিত, উদ্দীপ্ত হলেন অভিজিৎরা। ছোটো ছোটো এইরকম ব্যাবহারিক কৌশলের মাধ্যমে বিশ্বের অগণন দারিদ্র্যপৃষ্ঠ মানুষের জীবনে কিছুটা সুবাতাস বইয়ে দেওয়া যায় কি না, সেই ভাবনা থেকেই এই পথ চলার শুরু। গবেষণার কাজে আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলেন এমআইটি-র এক প্রাক্তনী। ২২০৩ সালে অভিজিৎ এবং দুফলো গড়ে তুললেন আর্থিক সহায়তাদানকারীর পিতার নামাঙ্কিত শেখ আবদুল লতিফ জামিল পভার্টি অ্যাকশন ল্যাব (জে-প্যাল)। বর্তমানে সেখানে চারশো অর্থনীতিবিদ কর্মরত। ২০০৭ সালে কলকাতার প্রখ্যাত চিকিৎসক অভিজিৎ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত লিভার ফাউন্ডেশন-এর সঙ্গে তাঁদের একটি গবেষণা পৃথিবীব্যাপী বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আর্কষণ করে। লিভার ফাউন্ডেশন উদ্যোগ নিয়েছিল বীরভূম জেলার গ্রামীণ কোয়াক ডাক্তার, অর্থাৎ হাতুড়ে চিকিৎসকদের কিছুটা শিখিয়ে-পড়িয়ে সুসংবদ্ধ স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজে লাগাতে। কিন্তু প্রশিক্ষণের ফলে তাঁদের কর্মকুশলতায় উন্নতি হচ্ছে কি না, তা বোঝা যাবে কী করে? জে-প্যাল প্রয়োগ করল আরসিটি। ১০২ জন কোয়াককে ন-মাস প্রশিক্ষণ দেওয়া হল এবং ১০২ জনকে রাখা হল প্রশিক্ষণের বাইরে। তারপর তাঁরা কীভাবে চিকিৎসা করছেন, তা যাচাই করতে গোয়েন্দারুগি পাঠানো হতে লাগল চেম্বারে চেম্বারে। ডাক্তার রুগি কেউই অবশ্য জানতেন না যে, তাঁরা একটি পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত, তাঁদের প্রতিটি কার্যকলাপ নথিভুক্ত হচ্ছে জে-প্যালের বিজ্ঞানীদের কম্পিউটারের হার্ডডিস্কে। এক বছর পরে ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেল প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মান্য করে চিকিৎসা করার প্রবণতা বেড়েছে যথেষ্ট। কমেছে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ লেখার প্রবণতা। এই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় বিশ্বখ্যাত জার্নাল 'সায়েন্স'-এ। লিভার ফাউন্ডেশন গবেষণালব্ধ তথ্য রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করলে সরকার তৎক্ষণাৎ তা নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। সেই সূত্রে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৭৩-টি গ্রামীণ স্বাস্থ্য-পরিষেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চলছে।

সস্ত্রীক। তাঁর কর্মক্ষেত্র এম আই টি-তে এক সাংবাদিক সম্মেলনে।

উন্নয়নমূলক অর্থনীতির সার্বিক গুরুত্ব বুঝতে হলে প্রথমে বুঝে নিতে হবে বিশ্ব-অর্থনীতির অ আ ক খ। এর মূল ধারা দুটি। একটি সমাজতান্ত্রিক এবং অপরটি ধনতান্ত্রিক। প্রথম ধারার মতে অর্থব্যবস্থার ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে জোরদার। সরকার ঠিক করে দেবে কোন খাতে কত খরচ হবে, কারখানা বা কৃষিক্ষেত্রে কী উৎপাদিত হবে, কতটা পরিমাণে হবে,

কলকাতায় মা (বাঁ-দিক থেকে চতুর্থ জন) ও পরিবারের সঙ্গে।

জীবনধারণের জন্য মানুষ কী পাবে, কত মূল্যে পাবে ইত্যাদি। এই ব্যবস্থায় দেখা যায় অতিরিক্ত লাভের সুযোগ না থাকায় সবই চলতে থাকে বাঁধা গতে। প্রতিযোগিতা না থাকায় নতুন সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে উৎকর্ষ অন্বেষণের দায়ও থাকে না। ফলে আর্থিক উন্নয়ন আটকে যায় চোরাবালির দ-য়ে। এর ঠিক বিপরীতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রবক্তরা বলেন অর্থব্যবস্থার ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ যত কম থাকবে অর্থব্যবস্থা তত শক্তিশালী হবে। এই ব্যবস্থায় টিকে থাকার মূলমন্ত্রই হবে প্রতিযোগিতা। তাতে যে জিতবে সে-ই দখল করবে বাজার। কিন্তু দেখা যায় সেই প্রতিযোগিতায় জেতার জন্য এমন সমস্ত পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়, যা কেবল নীতিবিরুদ্ধ নয়, এককথায় মানবতাবিরোধী। অর্থনীতির প্যাঁচে পড়ে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড় হয়। বোঝা দায় হয় মানুষের জন্য অর্থনীতি না কি অর্থনীতির জন্য মানুষ। অধুনা বিশ্বজুড়ে দ্বিতীয় ধারারই রমরমা। উন্নয়নমূলক অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক এবং বাজারসর্বস্ব ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়কারী একটি মধ্যপন্থা। অভিজিৎরা যে নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করেছেন, তার উদ্দেশ্য ধনতান্ত্রিক আর্থিক নীতিকে অন্তত কিছুটা জনমুখি করে তোলা। তার জন্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা দরকার দারিদ্র্যের চরিত্র। অভিজিতের মতে, সেই কাজটি প্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে করতে পেরেছিলেন জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস। দারিদ্র্য যে গতজন্মের পাপের শাস্তি নয়, এ-কথাটা যতক্ষণ না মেনে নেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে লড়াইও দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা পায় না। প্রচলিত ব্যবস্থা ধর্ম, অদৃষ্ট, পাপ ইত্যাদি ধারণাকে লালন-পালন করে এবং দারিদ্র্যের দায়ভার সেগুলোর ওপর চাপিয়ে প্রকৃত কারণগুলিকে মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে। ফলে জনগণও নিজেদের দুর্দশার কারণ হিসেবে কেবল নিজের দুর্ভাগ্যকেই দেখতে পায়। সরকারেরও তাই আর তেমন দায় থাকে না। দারিদ্র্যদূরীকরণের বরাদ্দ অর্থ খুব সহজেই সরিয়ে ফেলা হয় অন্য খাতে। বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো রয়েছে প্রকল্প লাগুকারী বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি। তলানিতে পৌঁছোনো বরাদ্দের সিংহভাগ শুষে নেয় সেই দুর্নীতি। তবে এখানেই শেষ নয়। মানুষের দ্বিধা, অজ্ঞানতা, ধর্মীয় বাধানিষেধ, পরিষেবা-কেন্দ্র থেকে বসবাসস্থলের দূরত্ব, এসবও প্রকল্পের সুবিধা থেকে তাকে বঞ্চিত করে রাখে। অভিজিৎ-অমর্ত্যর মতো অর্থনীতিবিদদের প্রচেষ্টা হল উন্নয়ন প্রকল্প এবং জনগণের মধ্যে দূরত্ব কমানো। সমূলে দারিদ্র্যের উচ্ছেদ ঘটানোর মতো পরিস্থিতি যখন নেই তখন এটাই মনে হয় সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। তা ছাড়া উন্নয়নমূলক অর্থনীতির প্রবক্তা উন্নয়নের কাজে ব্যয়-হ্রাসের বাধাস্বরূপ। সংবাদমাধ্যমে তাঁদের একটি বিবৃতি সরকারকে নিজের পায়ে খাড়া করে দিতে পারে। নোবেল পুরস্কার যেহেতু জনতার চোখে একজন হিরোর জন্ম দেয় সেহেতু পুরস্কারপ্রাপকের উপদেশ বা পরামর্শ বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলার আগে সরকারি কর্তাদের অন্তত আরেক বার ভাবতে হয়। অর্থাৎ, একটি পুরস্কার গরিব জনতার হয়ে নীতি নির্ধারণ এবং অর্থ বরাদ্দকারী সংস্থাগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। তাই অভিজিতের নোবেল পুরস্কার পাওয়া পরোক্ষে গরিব মানুষেরই ক্ষমতায়ন।

অর্থনীতিতে অভিজিৎদের আরসিটি প্রয়োগ কিন্তু প্রশ্নহীন নয়। প্রথমত, এটি সময় ও ব্যয়-সাপেক্ষ। দ্বিতীয়, এক জায়গার অভিজ্ঞতা আরেক জায়গায় প্রয়োগ করে যে সাফল্য পাওয়া যাবেই, তাও নয়। কারণ, মানবসমাজ চূড়ান্ত বৈচিত্র্যময়।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে অভিজিৎ অন্যান্য আরও বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ২০০৪ সালে তিনি আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ আর্টস অ্যান্ড সাইন্সের ফেলো নির্বাচিত হন। ২০০৯ সালে পান সোশ্যাল সাইন্স (ইকনমিক্স) বিভাগে ইনফোসিস পুরস্কার। ২০১১ সালে অভিজিৎ এবং দুফলো, তাঁদের কাজের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছিলেন 'পুয়োর ইকনমিক্স' নামে বই। অনেক পুরস্কার এবং অভিনন্দনে সমাদৃত হয়েছে সেই বই। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শ্রেষ্ঠ বিজনেস বুক হিসেবে ফিনানশিয়াল টাইমস ও গোল্ডম্যান সাকস-এর পুরস্কার। ২০১৯-এ প্রকাশিত হয়েছে নোবেলজয়ী ত্রয়ীর বই 'গুড ইকনমিক্স ফর হার্ড টাইমস'।

কেন একটি উন্নয়নপ্রকল্প সফল হয় আর কেনই-বা অন্যটি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না, তা বুঝতে গেলে যে নিবিড় অভিনিবেশে পাঠ করতে হয় মানুষের জীবনকে, তা তাঁরা করার চেষ্টা করেছেন।

সরস্বতী নদী শুকিয়ে যায়

অভিজিতের বড়ো হয়ে ওঠা যে-সময়ে সে-সময় বঙ্গ নবজাগরণের আলো ম্লান হয়ে এলেও আকাশ বর্ণময়। রামমোহন বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী সৃষ্টিধারার উত্তরাধিকার তখনও বহমান। সেই সারস্বত প্রবাহের উৎসমুখ কেবল জন্মগত মেধা নয়, মানুষের প্রতি ঐকান্তিক দরদ। অমর্ত্য বা অভিজিতের দারিদ্র্য সম্বন্ধীয় গবেষণার পিছনেও রয়েছে সেই উত্তরাধিকারের অনুপ্রেরণা। কিন্তু একাবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে সে-নদী মৃতপ্রায়। ধু-ধু বালুচরে এমসিকিউ-মেধা-আশ্রিত, জয়েন্ট-এন্ট্রান্সসর্বস্ব বাঙালি আবার কত দিনে ফোটাতে পারবে আরেকটি নোবেলপুষ্প, তার জন্য আমাদের অধীর আগ্রহে অপেক্ষা। ■

পাঁচ দশকের লেখকজীবনের সমাপ্তি টেনে চলে গেলেন আবদুর রাকিব। বাংলা সাহিত্যজগতে তিনি ছিলেন যেন প্রতিকূলে একজন। ব্যক্তিজীবনে ধার্মিক হয়েও উদারমনস্ক এই লেখক উপলব্ধি করেছিলেন— ধর্মীয় অনুষঙ্গ ছাড়া বাংলার মুসলিম জনজীবনের যথার্থ চিত্র নির্মাণ সম্ভব নয়। লেখককুলে নিঃসঙ্গ এই মানুষটির প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

প্রান্তজনের নিঃসঙ্গ কথাকার
আবদুর রাকিব

আবু রাইহান

স্বাধীনতার-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখযোগ্য মুসলিম মনীষা আবদুর রাকিব! পাঁচ দশকের লেখকজীবনে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও অনুবাদ সাহিত্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখলেও আবদুর রাকিব মূলত গল্পকার। গল্প লেখাতেই তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন পাঠক, সমালোচক ও সাহিত্যবোদ্ধাদের কাছে।

আবদুর রাকিবের পেশা ছিল শিক্ষকতা, নেশা ছিল সাহিত্য। তাঁর সাহিত্যের বিষয় ছিল গ্রাম্য সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। সারাজীবন ধরে গ্রামে বাস করেছেন এবং জীবিকার প্রয়োজনে গ্রামেই শিক্ষকতা করেছেন। যে-সমাজে বাস করতেন, সাধারণভাবে যে-সব মানুষদের দেখেছিলেন, সেই সমাজ এবং সমাজের মানুষই তাঁর গল্পের চরিত্র ও বিষয় উঠেছে। গল্পকার আবদুর রাকিব সৃজন করেছেন সমাজের বহুমুখী চরিত্র, তাদের জীবনের ওঠানামা, ভাব-অভাবের নানান বিষয়। কোনো জটিলতা নয়, সরল তাঁর ভাষা। মোলায়েম এক তন্ময়তা সৃষ্টি করে তিনি পাঠককে গল্পের দিকে টেনে রাখেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার মরমী কথাকার। চারপাশে ঘটে-যাওয়া অহরহ মনখারাপ করা ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেও কোথাও-না-কোথাও লুকিয়ে থাকা একটু ভালোর ইঙ্গিতকেই তাঁর গল্পে অসাধারণ ভাষাভঙ্গিমার প্রয়োগে তুলে ধরেছেন আবদুর রাকিব। বাস্তবের ধূসর প্রেক্ষাপটেও তিনি তাঁর গল্পে আশ্চর্য এক সম্ভাবনার কথা বলে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্যের উন্মোচন ঘটিয়েছেন। সাহিত্য সমালোচকদের অভিমত— সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রাঢ় বাংলার প্রান্তিক মুসলিম জনজীবনের সার্বিক জীবনকে অত্যন্ত কুশলী ভাষায় কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন আবদুর রাকিব। বলা যায়, রাকিব ছিলেন মুসলিম জনজীবনের একজন কুশলী ভাষ্যকার।

বীরভূমের মুরারই রেল স্টেশন থেকে সাড়ে সাত কিলোমিটার দূরে প্রাচীন জনপদ এদরাকপুর গ্রাম। সেই গ্রামে ১৯৩৯ সালের ১৬ মার্চ আবদুর রাকিবের জন্ম। শিক্ষকতার পাশাপাশি লিখেছেন কবিতা, জীবন-আলেখ্য, অনুবাদ সাহিত্য, ধর্মীয় সাহিত্য, উপন্যাস, বহু গল্প ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ। মুর্শিদাবাদ জেলায় শিক্ষকতা করতে গিয়ে দনদিঘির চারণকবি গুমানী দেওয়ানের সান্নিধ্যে আসেন। তাঁর কবিয়াল জীবনের উত্থানের কাহিনি সংগ্রহ করে ২৯ বছর বয়সে লিখে ফেলেন প্রথম গ্রন্থ 'চারণকবি গুমানী দেওয়ান' (১৯৬৮)। মৈত্রেয়ী দেবী সম্পাদিত দ্বিমাসিক নবজাতক-এ তাঁর লোককবি গুমানী দেওয়ান সম্পর্কিত রচনার দু-তিনটি অধ্যায় প্রকাশিত হলে বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আর্কষণ করে। সাহিত্যিক ও কাফেলা-সম্পাদক আবদুল আযীয আল-আমানের উৎসাহে হরফ প্রকাশনী থেকে এই জীবন-আলেখ্যটি পুস্তকাকারে প্রকাশ পেলে চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। 'কাফেলা' পুরস্কারে সম্মানিতও করা হয় লেখককে। ২০০১ সালে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হলে আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই গ্রন্থে আবদুর রাকিব গুমানী দেওয়ানের জীবনবৃত্তান্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই সঙ্গে তুলে ধরেছেন

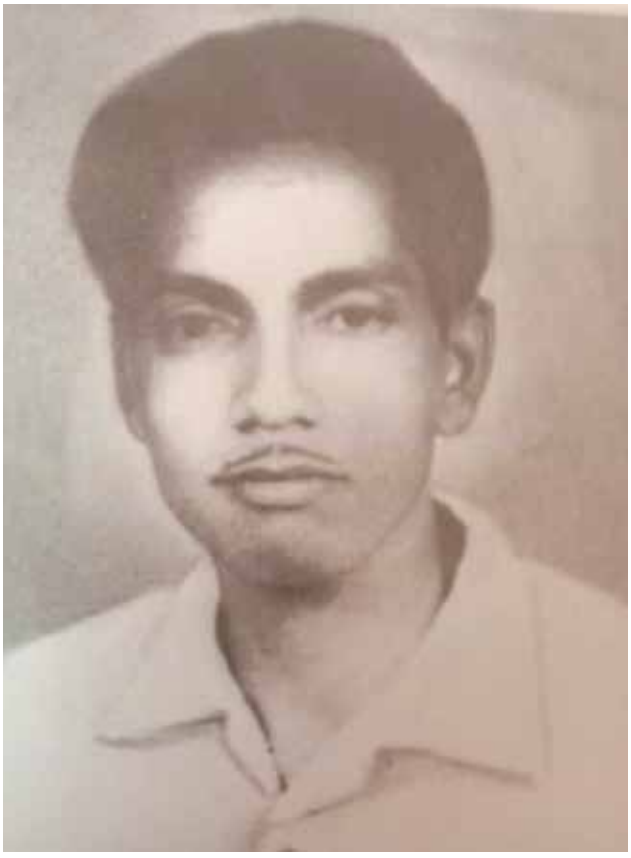

তখন তরুণ।

হাস্যরসে সিক্ত কবিগানের বিষয়বস্তুকে। দেশপ্রেম, দেশীয় ঐতিহ্য সব কিছুই সুচারুভাবে মেলে ধরেছেন। বইটি শুধু কবিয়াল জীবনের আলেখ্যই নয়; সমাজ, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম, মানবিকতা, ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, মানুষের জীবনজিজ্ঞাসা হয়ে উঠেছে বিষয়বস্তু। একটা যুগের ভাবনাই যেন কবিয়াল গুমানী দেওয়ানের পাঁচালিতে ফুটে উঠেছে। মেধাবী, তীক্ষ্ণ যুক্তিজালের সঙ্গে অপূর্ব হাস্যরসের মিলনেই বইটির শ্রেষ্ঠত্ব। পুস্তকটিতে ফুরিয়ে আসা লোকসাহিত্যের একটি ধারা জীবন্ত হয়ে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠ্য হিসেবে সেই কারণে বইটির এত জনপ্রিয়তা।

আবদুর রাকিবের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় বত্তিরিশটি। ২০১৮ সালের ২১ নভেম্বর মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি লেখালেখিতেই সক্রিয় ছিলেন। তাঁর লেখকজীবনকে মূলত তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথমত জাগরণ পর্ব (১৯৬০—১৯৬৫): মূলত জাগরণ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলিকে এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এটি ছিল আবদুর রাকিবের গল্প লেখার উন্মেষকাল। দ্বিতীয়ত, কাফেলা পর্ব (১৯৬৫—১৯৯৪): মূলত কাফেলা পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য লেখক। এই পর্বটি ছিল তাঁর লেখকজীবনের বিকাশকাল। তৃতীয়ত, নতুন গতি পর্ব (২০০৪—২০১৮): নতুন গতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই পর্বে আবদুর রাকিবের লেখালেখিতে পরিণত মনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই তিনটি পত্রিকা ছাড়াও জঙ্গিপুর সংবাদ, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বীরভূম প্রান্তিক, গণকণ্ঠ, মশাল, প্রবাল, কলম, দিন দর্পণ-এর মতো অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় তিনি লিখেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থতালিকায় রয়েছে দুটি গল্পগ্রন্থ—'প্রতিকূলে একজন' (শিল্পকলা, ১৯৬৭) ও 'বাদশাহ ও বাবুই বৃত্তান্ত' (মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০০), দুটি জীবনীগ্রন্থ— 'চারণকবি গুমানী দেওয়ান' (হরফ প্রকাশনী, ১৯৬৮) ও 'সংগ্রামী নায়ক মাওলানা আবুল কালাম আজাদ' (মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯২), একটি আত্মজীবনীমূলক পত্রোপন্যাস— 'পথ পসারীর পত্রোত্তর' (নতুন গতি প্রকাশনী, ২০০৬)। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বই— 'বাংলাভাষার পাঠ-নির্দেশ' (হরফ প্রকাশনী, ১৯৮৪)। জীবন-পরিচিতিমূলক গ্রন্থ— 'স্মরণীয় যাঁরা: মুর্শিদাবাদ' (মণ্ডল অ্যান্ড সন্স, ১৯৮৬) ও 'জীবনের জয়গান' (দি হিন্দুস্থান পাবলিশিং কোং, ১৯৯২)। তাঁর রচিত ইসলামি গ্রন্থতালিকায় রয়েছে— 'আল কোরআনের উপমা ব্যঞ্জনা' (হরফ প্রকাশনী, ২০০০), 'নবী জীবন' (হরফ প্রকাশনী, ১৯৮১), 'হযরত ইউসুফ আঃ' (হরফ প্রকাশনী, ১৯৮৯), 'আলোর নবীরা-৩' (হরফ প্রকাশনী, ১৯৯৪), 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' প্রথম খণ্ড (মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯২) ও 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' দ্বিতীয় খণ্ড (মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৩), 'ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান' (মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০২, 'একত্ববাদের মশাল দৌড়' (হরফ প্রকাশনী, ২০০০), 'মহিলা সাহাবী' (হরফ প্রকাশনী, ১৯৯৭)। এ ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য অনুবাদ পুস্তকগুলি হল— 'ইসলাম প্রসারের ইতিকথা' (The Preaching of Islam, টি ডব্লিউ আর্নল্ড, মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০০), 'স্পেনের মুসলিম ইতিহাস' (Spanish Islam: A History of the Moslems in Spain, Reinhart Dozy, মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০১), 'ইসলাম ও প্রাচ্যবাদ' (মারইয়াম জামিলা, মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০১) 'কাশফুল মাহজুব' (মূল: আলী বিন উসমান আল জুল্লবীর, রেনল্ড এ. নিকলসন-কৃত ইংরেজি থেকে, মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০১) 'ইসলাম ও ভারতীয় সংস্কৃতি' (Islam and Indian Culture, Dr B N Pandey, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৫), 'ইসলাম ও ইসলামী নীতিতত্ত্ব' (Islam and the Ethics of Islam, Syed Amir Ali, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৫), 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' প্রথম খণ্ড (ইমাম গাজ্জালী রহ., মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৫), 'দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস অফ মোহাম্মদ' (জন ব্যাগট গ্লোবি, দি থার্ড ওয়ার্ড প্রেস), 'ইউরোপের মুসলিম মানস' (মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০১), 'ইসলামের মরমী প্রবণতা' (এম এম জুহুরুদ্দিন আহমদ, লেখা প্রকাশনী, ২০০১), 'মৃত্যুর পরে কী হবে?' (মাওলানা আশিক ইলাহী, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯), 'তাযকিরাতুন আম্বিয়া' (আল্লামা ইবনে কাসির, মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০০), 'ইসলামী রেনেসাঁ (মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ., মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০০), 'শামাইলে তিরমিযী' (ইমাম আবু মুসা তিরমিযী রহ., মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০০), 'সম্মানের মূল্য' (মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০১) ইত্যাদি। অনুবাদ সাহিত্যে আবদুর রাকিবের মুন্সিয়ানা তারিফযোগ্য।

১৯৬০ সালে তাঁর প্রথম বড়োগল্প 'শেষ মিলনের লগ্নে' জাগরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কলকাতা-কেন্দ্রিক বাণিজ্যিক পত্রিকায় এটাই তাঁর প্রকাশিত প্রথম লেখা।

আদ্যন্ত ইসলামি ঐতিহ্য ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী থেকেও মানবতাবাদী গল্পকার আবদুর রাকিব সবসময় নৈতিক বোধের কেন্দ্রে জীবনকে

২৯ বছর বয়সে লিখে ফেলেন প্রথম গ্রন্থ 'চারণকবি গুমানী দেওয়ান' ১৯৬৮। মৈত্রেয়ী দেবী সম্পাদিত দ্বিমাসিক নবজাতক-এ তাঁর লোককবি গুমানী দেওয়ান সম্পর্কিত রচনার দু-তিনটি অধ্যায় প্রকাশিত হলে বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দেখেছেন। গল্পের নির্মাণশৈলী ও বিষয়বস্তুর গুণে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন পাঠককে এবং তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী। অত্যন্ত ভাষাসচেতন এই কথাকারের গল্পগুলির সিংহভাগই সমকালীন গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত। তাই তাঁর গল্পের চরিত্রসকলও বেশিরভাগই গ্রামের দরিদ্র খেটে খাওয়া মানব-মানবী। এদের অধিকাংশই বিত্তহীন, কৌলিন্যহীন সাধারণ মানুষ। অথচ গল্পগুলো পাঠ করলে বোঝা যায়— ওইসব হতদরিদ্র, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পড়া চরিত্রগুলো সব সময় নৈতিক মূল্যবোধে জীবন্ত। বাস্তবের রূঢ় প্রেক্ষাপটে বেড়ে ওঠা চরিত্রগুলি মরমী গল্পকার আবদুর রাকিবের লেখনীর গুণে সর্বদা নতুন নতুন সম্ভাবনা নিয়ে জেগে ওঠে। তাঁর গল্পের নারী চরিত্ররাও এক-একটা রত্নস্বরূপা। কিভাবে সামান্য চরিত্রও, বিশেষ করে নারী চরিত্র, গল্পকারের মানবিক ছোঁয়ায় অসামান্য হয়ে পাঠকের হৃদয়মূলকে নাড়িয়ে দেয়, তা গল্পগুলো না পড়লে বোঝা যাবে না। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল— 'কিংবদন্তির বিল', 'মানুষের স্বর', 'রমজানের রাত ডাকে', 'সাহরী জননী', 'তাসবিহ দানা', 'ঝুলন্ত নীড়', 'প্রতিকূলে একজন', 'স্মৃতির উপাখ্যান', 'বিদায় সংবর্ধনা', 'বাতায়ন', 'ঘেরাটোপ', 'খাঁচা ও পাখির পাঁচালী', 'খোপের মানুষ', 'সম্পর্কের ইতিবৃত্ত', 'উত্তরাধিকার', 'মানপত্র', 'পুলিশের বউ', 'শব্দছক', 'সংশোধনাগার' ইত্যাদি।

'কিংবদন্তির বিল' নামক গল্পটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে একটি বিলকে ঘিরে। কিংবদন্তির বিল সম্পর্কে গল্পকারের মন্তব্য, বিলকে ঘিরে রয়েছে একটি কাহিনি। এক চাষীর মেয়ে বাপের জন্য মাঠে খাবার নিয়ে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি, ভেসে যায় বানের পানিতে। পরে একদিন এক চুড়িওয়ালা তার বাপের কাছে চুড়ির দাম চায়। সে নাকি জলাভূমির ধারে কিশোরী মেয়ের হাতে দু-গাছা চুড়ি পরিয়ে দেয়। মেয়ে বলে, বাড়ির এক কৌটায় পয়সা রয়েছে। বাপ যেন তা বার করে দেয়। অবাক চাষী ছুটে

এই কথাকারের গল্পগুলির সিংহভাগই সমকালীন গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত। তাই তাঁর চরিত্রসকলও বেশিরভাগই গ্রামের খেটে খাওয়া মানব-মানবী। এদের অধিকাংশই বিত্তহীন, কৌলিন্যহীন সাধারণ মানুষ। অথচ গল্পগুলো পাঠ করলে বোঝা যায়— ওইসব হতদরিদ্র, শিক্ষা সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পড়া চরিত্রগুলো সব সময় নৈতিক মূল্যবোধে জীবন্ত।

যায় জলাভূমিতে। দেখে, কেউ নেই কোথাও। তবু বলে, মাগো, কী করে বুঝব তুই রাঙা চুড়ি পরেছিস? অমনি পানির তলা থেকে পদ্মডাঁটার মতো উঠে আসে এক জোড়া চুড়ি-পরা হাত। তারপর একটু একটু করে আবারও তলিয়ে যায়। মরমী কথাকারের পরম মমতার তুলির টানে গল্পটি অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। এ গল্প পড়তে পড়তে পাঠক অন্য জগতে চলে যান।

কাটরা দাঙ্গার প্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর তাঁর একটি অসাধারণ ছোটগল্প 'মানুষের স্বর'! ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সে-দেশ থেকে বহু হিন্দু পরিবার উদ্‌বাস্তু হয়ে এ-বাংলায় পাড়ি জমান। ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসায় তাদের জীবন যেমন বিপন্ন হয়েছে, তেমনি এদেশীয় মুসলমানদের প্রতি তাদের ক্ষোভও তীব্রতর হয়েছে।

চরৈবেতি আয়োজিত গুনীজন সম্মাননা সভায় সম্মানিত আবদুর রাকিব।

শিবনাথও স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে প্রথমে ধুবুলিয়া, পরে কৃষ্ণনগর, তারও পরে মুর্শিদাবাদের গোয়ালজনে উদ্‌বাস্তু জীবন কাটিয়েছে। শিবনাথ এখন রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল লেখক। ১৯৮৮ সালে ২৩ জুন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মৃত্যুদিবস উপলক্ষে বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কাশিমবাজারে সভা করে। কাটরা মসজিদে যারা নামাজ পড়তে আসবে, তাদের নিধন করার ছক তৈরি হয় সভায়। এই কর্মসূচিতে শামিল হয় তার দুই ছেলে অনিল ও সুনীল। কিন্তু বাবা শিবনাথ ও মা বাসন্তীর সায় ছিল না এতে। রাতে বাড়িতে গোলাবারুদসহ খুনি গুণ্ডাকেও আশ্রয় দিতে হয়েছে তাদের। পরদিন নসিপুরে ট্রেন থামিয়ে বেছে বেছে মুসলিমদের কচুকাটা করা হয়। আফতাবের পা কেটে দিলেও প্রাণে বাঁচে। কাতরাতে কাতরাতে রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি ওখান থেকে সরে যাবার সময় আফতাব উদ্ধার করে এক ধর্ষিতাকে। তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয় সে। এই মেয়ে ঝুমা, শিবনাথের মেয়ে, আর ধর্ষক সেই গুপ্তা, যাকে নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল অনিল-সুনীলরা। সমস্ত ঝুঁকিকে তুচ্ছ করে শিবনাথ সে-রাতে আফতাবকে থেকে যাওয়ার আবেদন জানায়। এই প্রথম মানুষের স্বর শুনতে পেল আফতাব। মানবতাবাদের অনন্য নজির সৃষ্টি করে আফতাবও যেমন, তেমনি শিবনাথও এই গল্পে সম্প্রীতির বাতাবরণ নির্মাণে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

'রমজানের রাত ডাকে' গল্পটি রমজান মাসের ধর্মীয় ভাবনাকে কেন্দ্র করেই রচিত। মুসলিমদের সামাজিক জীবনে ধর্মীয় অনুষঙ্গের এক নিটোল বুনোট রয়েছে এই গল্পের বর্ণনায়। রমজানের ভোরের একটা আলাদা মর্যাদা রয়েছে। এখন মাইকে মানুষকে জাগিয়ে দেওয়া হয় সেহরি খাওয়ার জন্য। যখন মাইক ছিল না, তখন কোনো কোনো গ্রামে টহল-সম্প্রদায় ইসলামি গান গেয়ে, কোথাও গ্রামের যুবকরা স্বেচ্ছাশ্রমে মানুষের ঘুম ভাঙাত। যেখানে কেউ নেই সেখানে তৈয়বজির মতো মানুষ আছেন। রমজান মাসব্যাপী গ্রামে ঘুরে ঘুরে সেহরির জন্য প্রত্যেক মানুষকে জাগ্রত করা তাঁর নেশা। সারা মাসে তিনি যা অর্থ সাহায্য পান, তার সর্বস্ব তিনি অনাথ-এতিমদের মধ্যে বিলি করে দেন। দিনের বেলা মানুষটি কোথায় কোন পাড়ার মসজিদে অথবা কোন গ্রামে থাকেন, কেউ জানে না। রহস্যময় এই মানুষটিকে নিয়ে একটি জনশ্রুতি এলাকার মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। মিথ্যা

বক্তৃতারত আবদুর রাকিব।

সাক্ষ্য দেননি, তাই তাঁর জমিজমা গেছে। স্ত্রী বিবাগী হয়েছেন। মেয়ের বিয়ে দিয়ে তিনি সংসারের বাঁধন ছিন্ন করেছেন। কখনো রাজমহল শাহি মসজিদে থাকেন, কখনো পাথর ভাঙেন, কখনো-বা কুলির কাজ করেন। ভিক্ষে করেন না। শুধু রমজান মাসে চলে আসেন গ্রামেগঞ্জে। সেহরির সময় মানুষকে জাগিয়ে বেড়ান। তৈয়বজির ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা শিক্ষক তাঁকে কিছু দান করার আগ্রহ প্রকাশ করলে তৈয়বজি কাফনের কাপড়টুকু চেয়েছেন। তাঁর ভাষায়— নিজের জন্যও কিছু রাখি না। এই পোশাকটা কাছে থাক। কোথায়, কখন কী অবস্থায় দু-চোখ বুজব, সেদিন যেন নতুন পোশাক পরে কবরের তলায় যেতে পারি। নতুন পোশাক, সুগন্ধি আতর, অনেক মানুষের ভিড়, অজস্র দোওয়া, সেই তো আমার ইদ। শুধু ধর্মীয় অনুষঙ্গ দিয়ে যে এরকম একটি নিটোল গল্প লেখা যায়, তা গল্পকার দেখিয়েছেন।

সাহিত্যিক আবদুর রাকিবের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'সংগ্রামী নায়ক মাওলানা আবুল কালাম আজাদ'। এটি মাওলানা আবুল কালাম আজাদের বৌদ্ধিক জীবনীগ্রন্থ। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত একটানা সাত বছর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ আমৃত্যু স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ের বছরগুলিতে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সূক্ষ্মদর্শী। কিন্তু এর আড়ালে তাঁর ইসলামিক জ্ঞান ও চেতনা, নৈতিককতা ও মূল্যবোধ, মুসলিম সমাজভাবনা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের উজ্জ্বল অধ্যায়টি অনালোচিত থেকে যায়। মাওলানা আবুল কালাম আজাদের জীবনের সেই দিকটি তুলে ধরেন বিদেশী লেখক ইয়ান এইচ. ডগলাস। সেটি আসলে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের বৌদ্ধিক জীবন। এই পুস্তক ও অন্যান্য তথ্যসূত্র থেকে সাহিত্যিক আবদুর রাকিব বাঙালি পাঠকদের জন্য মাওলানা আবুল কালাম আজাদের জীবনের অনালোকিত অধ্যায়টি আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন, বাংলা ভাষায় যা এক অনন্য প্রয়াস। পুস্তকটি তাঁর শীলিত ভাবনা, অনুসন্ধিৎসু মন ও ভাষার চমৎকারিত্বে উজ্জ্বল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এই পুস্তকের একটি অধ্যায় সংক্ষিপ্তাকারে সপ্তম শ্রেণির বাংলা পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছে। তার পরেও প্রতিবেশী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ যখন সাম্প্রদায়িক মানসিকতা নিয়ে এই পুস্তকটির একপেশে সমালোচনা করেন, তখন ব্যথিত হৃদয়ে সাহিত্যিক আবদুর রাকিব তাঁর আত্মজীবনীমূলক পত্রোপন্যাস 'পথ পসারীর পত্রোত্তর' পুস্তকে লিখতে বাধ্য হন— "একজন হিন্দু লেখক লেখেন অবাধে! কে কি মনে করবেন, না করবেন না, এ নিয়ে তাকে ভাবতে হয় না। অনায়াসে তাঁর সমাজ-সংস্কৃতির কথা বলতে পারেন। সেক্ষেত্রে একজন মুসলিম লেখকের কলম বড় কুণ্ঠিত। তাঁকে প্রতিমুহূর্তে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হয়। মাওলানা আবুল কালাম আজাদের উপর আমার একখানি বই রয়েছে। তাতে তাঁর রাজনীতির কথা খুব বেশি নেই। রয়েছে তাঁর ধর্মীয় চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিকোণ। ঋণ স্বীকার করে বহু তথ্য নিয়েছি ডগলাসের 'ইন্টেলেকচুয়াল বায়োগ্রাফি' থেকে। আমাদের প্রজন্মটি রাজনীতিক আবুল কালাম আজাদকে যতটা চেনে, ততটা চেনে না মাওলানা আজাদকে। তাই ইচ্ছে করে, তাঁর ধর্মীয় জীবনের উপরেই জোর দিই। এর রিভিউ করতে গিয়ে একখানি প্রখ্যাত দৈনিক বলে, এ বইয়ে মাওলানাকে নাকি সংকীর্ণ করা হয়েছে। এবং মনে করা হচ্ছে বইখানি যেন কেবল মুসলমানদের জন্যই লিখিত। অচিরেই যদি তাঁর জীবনী লেখা না হয় তবে আমার বইখানি নাকি একটা খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।"

'চারণ কবি গুমানী দেওয়ান' গ্রন্থটি বোদ্ধা পাঠক ও গবেষকদের কাছে সমাদৃত হওয়ায় সাহিত্যিক আবদুর রাকিব লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত গ্রামবাংলার আলকাপ নিয়ে 'আলকাপের রাজা' নামক পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করেন। একসময় গ্রামবাংলায় আলকাপ গানের আসরে শ্রোতারা ভিড় জমাত। এই লোকগান এখন বর্তমানের সিনেমা ও টিভি সিরিয়ালের দৌলতে হারিয়ে গিয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য 'আলকাপের রাজা' লেখাটিও পুস্তক আকারে প্রকাশিত না হওয়ায় গ্রাম্য কথকথার এরকম একটি মূল্যবান গ্রন্থ পাঠ করা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। গ্রন্থটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হলে 'চারণ কবি গুমানী দেওয়ান'-এর মতো 'আলকাপের রাজা' পুস্তকটিও লোকসাহিত্য চর্চায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হত।

আলকাপের গান ছিল গ্রাম্য। কিন্তু সুর ও স্বর ছিল লোকায়ত, মেঠো রাখালের গলায় যা মানিয়ে যেত! সে গানে ছিল স্বভাবকবিত্ব! অমার্জিত কিন্তু অক্ষম অনুকরণ নয়! দলের ওস্তাদ অবশ্যই বিদ্যেবোঝাই বাবু ছিলেন না। কিন্তু সাঁতার জানতেন। মুখে মুখে গান কিংবা ছড়া বানাতে পারতেন। আলকাপের সংলাপও ছিল তাৎক্ষণিক। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল আলকাপের সেরা সম্পদ, যা বিস্ময়ের অভিঘাত সৃষ্টি করে শ্রোতৃহৃদয়ে নাড়া দিত। পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আলকাপে আসে বন্ধ্যাত্ব। মনোরঞ্জনের বিপুল আগ্রহে নানা উদ্ভাবনী কৌশলে আলকাপ ঝাল টক নুন মিষ্টির ভিয়ানে পরিণত হয়ে যায়। জনতাও প্রথম প্রথম সে রস পান করে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পানের আগ্রহ ও পিপাসা কমে যায়। কেননা, সিনেমা তখন ভিডিও হয়ে ঢুকে পড়েছে গ্রামের অন্দরমহলে। যারা হিন্দি বা বাংলা সিনেমার গান শুনতে চায়, তারা ছবি দেখবে। ওই সব

আবদুর রাকিব প্রকৃত আর্থেই ছিলেন সাহিত্যসাধক। উদার ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সুস্থ সংস্কৃতি ও বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির অনন্যতায় তিনি ছিলেন অন্যদের চেয়ে আলাদা। তাঁর স্বাদু গদ্যে নির্ভার রচনা রসিক পাঠককে অনাবিল আনন্দ দেয়।

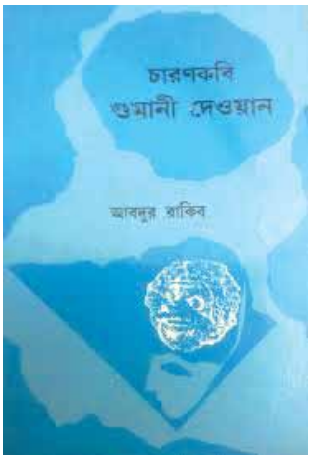

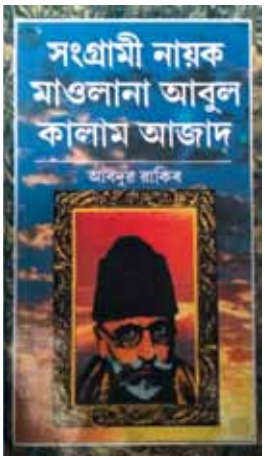

গানের বিকৃত শব্দ শোনার জন্য পঞ্চরসের আসরে যাবে কেন? এসব নিয়ে লেখকের মনে একটা কষ্ট ছিল। আলকাপের অপমৃত্যু তাঁর ভালো লাগেনি। মনে হত, হয়তো পঞ্চরসের বিপুল কোলাহলের মধ্যেও কোথাও আলকাপের মৌলিকত্ব টিকে রয়েছে। খোঁজ করলে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। আলকাপের মৌলিকত্বের খোঁজেই ভিতরে ভিতরে তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন। আর পুরাতন দিনের আলকাপশিল্পীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর আলকাপের রাজা পরিবর্তনকামী ঝাকসু নয়, ঝাকসুকে সম্মানের নির্বাসনে রেখে তিনি বেছে নেন অতি সাধারণ এক আলকাপশিল্পীকে।

তাঁর আক্ষেপ— তো, কী করে কাউকে বোঝাব যে, যখন গল্প লিখি তখন উপন্যাস লেখা যায়। লিখেছি, যখন কাফেলা মাসিকের ধারাক্রম ছিল। সেবার ইদ সংখ্যা কাফেলায় প্রকাশিত হয় 'দূরপাল্লার দৌড়'। পরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'নহর', জঙ্গিপুর সংবাদ-এর পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'কক্ষপথ'। মৃণাল সাহার ধূসর পাণ্ডুলিপির শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'সমুদ্রগামিনী'। যে জাগরণের ইদ সংখ্যায় 'শেষ মিলনের লগ্নে' দিয়ে আমার সাহিত্যের হাতেখড়ি, সেটিও উপন্যাস। হয়তো উল্লিখিত রচনাগুলি ঢাউস নয়, কিন্তু চরিত্রধর্মে উপন্যাসই তো বটে।

সাহিত্যিক আবদুর রাকিবের নতুন গতির ইদ সংখ্যায় স্বল্প দৈর্ঘের উপন্যাস 'কবিতার ফেরিওয়ালা' ও তিনটি পর্বে বৃহদাকারে 'বাঁশলোইয়ের বান' উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ-দুটি উপন্যাসও এখনও পর্যন্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি।

আবদুর রাকিব তাঁর আত্মজীবনীমূলক পত্রোপন্যাস 'পথ পসারীর পত্রোত্তর'-এ স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের সাহিত্য সৃষ্টির সংকটময় সময়কে ঐতিহাসিক দায়বদ্ধভাবে তুলে ধরেছেন। 'পথ পসারীর পত্রোত্তর' সাহিত্যিক আবদুর রাকিবের পরিণত বয়সের রচনা। কেবল জীবনের পথে নয়, সাহিত্যের রাজপথ ধরে অনেক দূর এগিয়ে আসার পর প্রাজ্ঞ মনন যে কোনো কারণেই হোক নিজেকে ব্যক্ত করার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। লাইলী নামের এক কল্পিত আপাকে উদ্দেশ করে লিখিত পত্রের সংকলন এই গ্রন্থ। মোট বাইশটি পত্র সংকলিত হয়েছে। তবে পত্রগুলি সবই একমুখী, অর্থাৎ পত্রোত্তর। লাইলী আপার জিজ্ঞাসার উত্তরে লেখা হয়েছে পত্রগুলি। যে জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে এইসব পত্র রচনা করা হয়েছে, পাঠক কখনো স্পষ্টভাবে, কখনো-বা অস্পষ্ট রূপে তার সন্ধান পান। জীবন বিস্তৃত, 'পথ পসারীর পত্রোত্তর'-এ এই বিস্তৃত পরিসরে আবদুর রাকিব তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যিক জীবনকে পরিবেশন করেছেন। এই রচনা আসলে সময় ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকতায় আকীর্ণ আত্ম-অন্বেষণমূলক রচনা।

সাহিত্যিক সম্পাদক এবং প্রকাশক আবদুল আযীয আল-আমানের সাহিত্যচর্চা নিয়ে সাহিত্যিক আবদুর রাকিব লিখেছিলেন 'আমান সাহিত্যের আকাশ'। 'আমান সাহিত্যের আকাশ' নামের পাণ্ডুলিপিটি সাহিত্যিক আবদুর রাকিবের কাছ থেকে হরফ প্রকাশনী নিয়েছিল পুস্তক করার জন্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, এই পাণ্ডুলিপিটি তারা নাকি হারিয়ে ফেলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই 'আমান সাহিত্যের আকাশ' পাণ্ডুলিপিটিও পুস্তক হিসেবে প্রকাশের মুখ দেখেনি। হরফ প্রকাশনী ১৯৯৬ সালে 'স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম লেখকদের গল্প সংকলন' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করে। এই গল্প-সংকলনটির সমস্ত গল্প বাছাই করেছিলেন আবদুর রাকিব। শেষ পর্যন্ত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সম্পাদনায় পুস্তকটি প্রকাশ পায়।

পশ্চিমবঙ্গের তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ হলেন মুসলমান সমাজ। সেই সমাজের চিত্র শক্তিশালী সাহিত্যিকদের কলমে বাংলা সাহিত্যে সেভাবে প্রতিফলিত হয়নি। সাহিত্যিক আবদুর রাকিবের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল গল্পে নিজস্ব সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র অনায়াসে ফুটিয়ে তোলার। গল্পে তিনি এমন সব বিষয় এনেছেন সেগুলি গল্পের বিষয় যে হতে পারে, তা পাঠকের ধারণার বাইরে ছিল। "আপনার গল্পে সুগন্ধ থাকে, এর কারণ কী!" এই প্রশ্নের উত্তরে সাহিত্যিক আবদুর রাকিব জানিয়েছিলেন, অজস্র মন্দের মধ্যে কোথাও না কোথাও একটু ভালো থাকে! সেটুকু খুঁজেপেতে তুলে ধরি বলে পাঠকের এমন মনে হয়। মানে, বাস্তবে যা নেই, থাকলে ভালো হয়। এমন সম্ভাবনার কথা বলি বা লিখি বলে হয়তো পাঠক তার নির্যাসটুকু পান।

স্বাধীনতা-উত্তর এই বাংলার সাহিত্য-অঙ্গনে মুসলিম সমাজ ঐস্লামিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সাহিত্যিক আবদুর রাকিব তাঁর কলমকে ব্যবহার করেছিলেন। ব্যক্তিজীবনে ধার্মিক এবং উদারমনস্ক আবদুর রাকিবের ধর্মভাবনা ছিল সুদৃঢ় মানবধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি সেই ভাবনাকে তাঁর গল্পে স্থাপন করতে আমৃত্যু উদ্যমী ছিলেন। ধর্মীয় অনুষঙ্গের সার্বিক প্রয়োগ তাঁর কথাসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মুসলিম জনজীবনের যথার্থ চিত্র নির্মাণ এই ধর্মীয় অনুষঙ্গ ব্যতীত বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তিনি তাঁর কুশলী প্রয়োগে সেই কাজে সফল হয়েছেন।

আবদুর রাকিব প্রকৃত অর্থেই ছিলেন সাহিত্যসাধক। উদার ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সুস্থ সংস্কৃতি ও বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির অনন্যতায় তিনি ছিলেন অন্যদের চেয়ে আলাদা। তাঁর স্বাদু গদ্যে নির্ভার রচনা রসিক পাঠককে অনাবিল আনন্দ দেয়। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে মনে উপন্যাসিক হওয়ার সুপ্ত বাসনা থাকলেও খুব বেশি উপন্যাস লিখে যেতে পারেননি। তাঁর পরিচিতি ছোটোগল্পকার হিসেবে। মরমী গল্পকার হিসেবে তিনি পাঠকের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। এই দুটি গল্পের বইও বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। তাঁর অনূদিত ধর্মীয় পুস্তকগুলি ছাড়া তাঁর লেখা মৌলিক গ্রন্থগুলির মধ্যে 'চারণকবি গুমানী দেওয়ান' এবং 'পথ পসারীর পত্রোত্তর' ছাড়া সাহিত্যিক আবদুর রাকিবের লেখা পাঠক পড়তে চাইলে হাতের নাগালে পাওয়া খুব দুষ্কর। তাঁর বেশিরভাগ গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর নিজস্ব উদ্যোগহীনতায় হোক কিংবা তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহিত্য-গোষ্ঠীর উদাসীনতার কারণেই হোক, আবদুর রাকিবের পাঁচ দশকের সাহিত্যচর্চার যে ফসল তা পুস্তকাকারে সামান্যই সংকলিত হয়েছে। তাঁর অনুরাগী এবং শুভানুধ্যায়ীরা এখনই যদি উদ্যোগী হয়ে আবদুর রাকিবের নির্বাচিত লেখার সংকলন প্রকাশ করার উদ্যোগ না নেন, অন্যান্য অনেক শক্তিশালী লেখকদের মতো এই মরমী কথাকারও অদূরভবিষ্যতে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবেন। অন্তত এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। ■

চলে গেলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। যেন-বা নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে। বাংলা উপন্যাসে তাঁর একের পর এক পদচারণা তাঁকে যেমন নিয়ে গেছে বাংলার সিক্ত মাটি-জল-জঙ্গল-মানুষের দিকে, তেমনই তাঁর সেই পথই কখনো-বা মাটি ছাড়িয়ে উঠে গেছে নীল দিগন্তের ঊর্ধ্বে এক আশ্চর্য মায়াজগতে। এ-সংখ্যায় তাঁর প্রতি আমাদের স্মরণলেখা।

এক লেখকের অলৌকিক যাত্রা

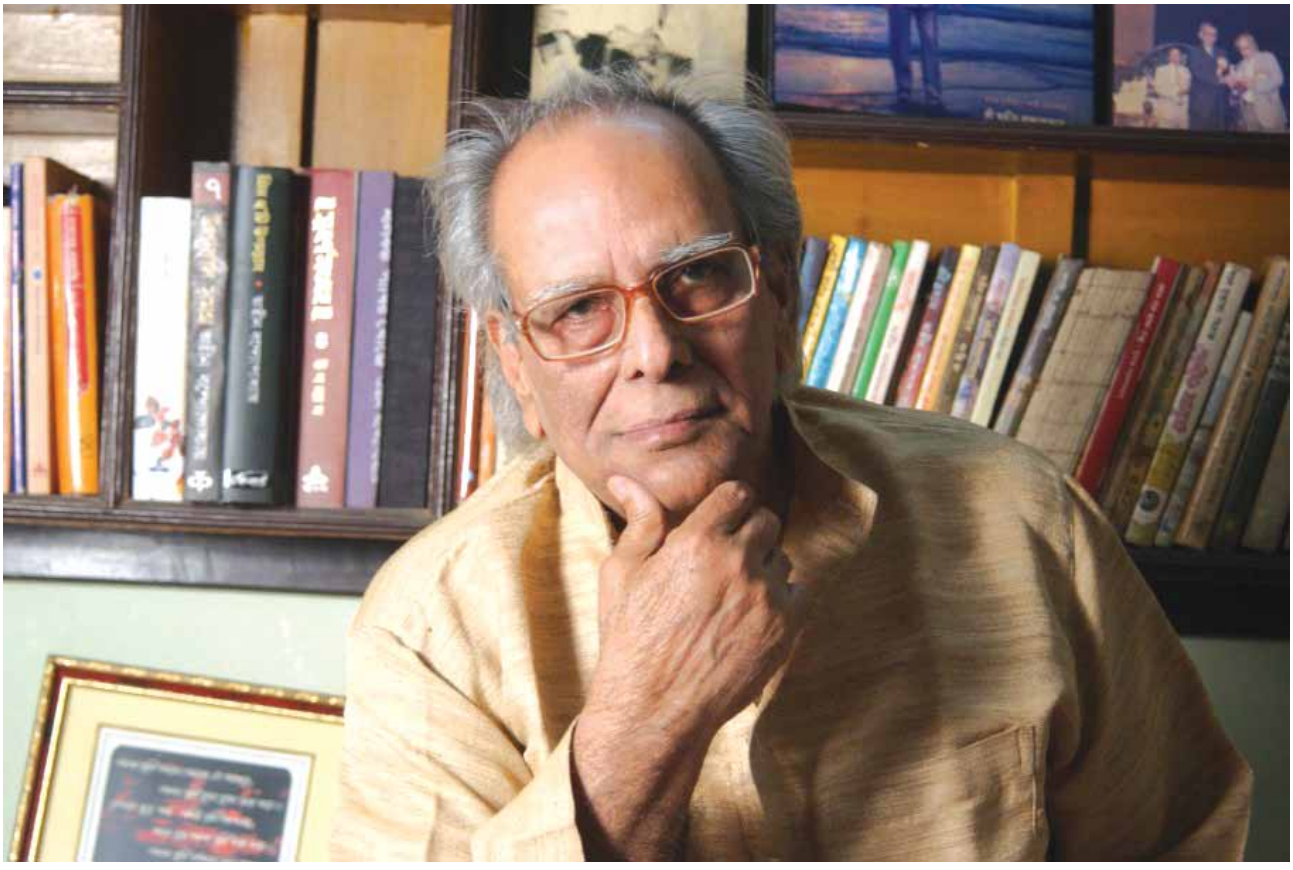

রণজিৎ অধিকারী

এই তো মোত্রাঘাসের জঙ্গল পার হলেই বঞ্চিতদের বোন্না গাছ— তারপর গন্ধপাদালের ঝোপ, আশেপাশে কালমেঘের জঙ্গল, পাশেই দত্তদের পুকুর বেতের ঝোপ। তারপর ঘন বৃষ্টি ... এই জলে জলে একদিন এই দেশটা বর্ষায় ভাসবে— তখন ঘাটে ঘাটে নৌকা, দত্তদের পুকুরে মাঝিবাড়ির পুকুরে যত নৌকা বানানো আছে সব ভাসানো হবে; তখন এ-বাড়ি নদীর এপার ওপার মনে হবে। বুড়ি আর রসো ছোটো ডিঙিনৌকা নিয়ে হিজলের ছায়া ভেঙে বেতঝোপের পাশে পাতি শাপলা তুলতে যাবে— জলের নীচে নেমে দেখবে পুঁটি মাছেরা খেলছে।

একদিন ছাইরঙের আকাশ ভেঙে জোর বৃষ্টি নামবে। সোনা ধানমাঠে নেমে গাভিন বোয়ালের প্রসবের এক নিমজ্জিত গন্ধ টের পাবে। সোনা তো এইভাবেই বড়ো হতে থাকবে। সোনা আর ফতিমা এক নির্জন মজা দিঘির পাড়ের ঘন বনের ভেতরে বকুল ফল খুঁজতে গিয়ে হারিয়ে যাবে। সোনা আর ফতিমা দুই হিন্দু-মুসলমান বালক-বালিকা এইসব বিপুল মাঠঘাটের প্রসারতায় মানুষ হতে থাকবে। যদিও গোঁড়া হিঁদুয়ানি সোনাকে জামাকাপড় ছেড়ে ফেলতে বাধ্য করবে ফতিমাকে ছুঁয়ে ফেলার দোষে। এখনও

বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে মুসলিম লিগের প্রতাপ শুরু হয়নি।

নিঃস্ব দরিদ্র মানুষগুলোর ঘরবাড়ি আর তারই মাঝে মাঝে ছলিমুল্লার তরমুজ খেত, নদী অতিক্রম করে গিরিশ মাঝির তরমুজের জমি। সোনালি বালির নদীর চরে ঈশমের তরমুজ খেত। মাঠময় সোনালি ধানের গন্ধ। উপরে আকাশ নীচে তরমুজ খেত সামনে সোনালি বালির নদী। ধনকর্তার পোলা হয়েছে বলে ঈশম বড়ো আনন্দে সোভান আল্লা বলতে বলতে সড়ক ধরে উঠে আসতে চাইছে। সে সড়কের একধারে গামছা পাতে— গামছা ঘাসের শিশিরে ভিজে যায়। সে খালের জলে অজু করে হাঁটু ভেঙে বসে অঘ্রানের শেষবেলায় নামাজ পড়ে। সে ধনকর্তাকে এই শুভসংবাদ দিতে যাবে— তার আগে বড়োবউ ঈশমকে খেতে দেয়। বড়ো বউয়ের মায়া হয়— ঈশমের ভাঙা ঘর, পঙ্গু বিবি, নাড়ার বেড়া— সে পেট ভরে খাওয়ায় ঈশমকে। আবার এই দেশ থেকেই বিধবা যুবতী মালতী অপহৃতা ধর্ষিতা হয়ে যায়। জব্বরদের লোলুপ লালসা এইভাবে কত হিন্দু রমণীর সর্বনাশ করে দেয়।

এই হল গত শতকের মাঝামাঝি সময়ের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট। জমিভরা ধান, পাট, ডাল, অফুরন্ত মাছ, তাঁত চলে— তবু অভাবের যেন অন্ত নেই। আর এই অভাবী মানুষগুলোর বেশিরভাগই মুসলমান। অধিকাংশ জমির মালিক হিন্দু, শিক্ষা হিন্দুদের, সম্পদ হিন্দুদের— মুসলমানরা শোষিত অথচ নির্বিকার। তাই মুসলিম লিগের কাজ শুরু করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েই ছিল।

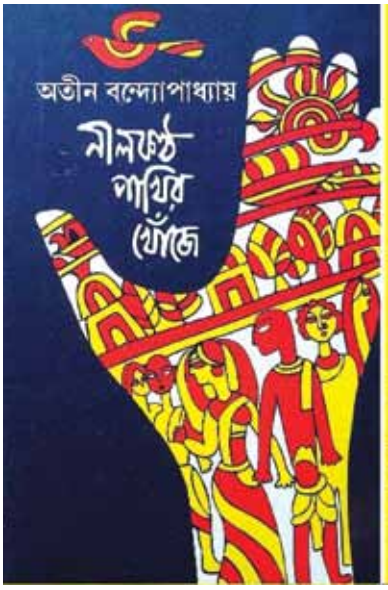

লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক সমস্যার এই জায়গাটা ধরতে চেয়েছেন তাঁর অজস্র গল্প-উপন্যাসে। কোনো পক্ষপাত নেই, লঘু জনপ্রিয়তা পাবার লোভ নেই। একটা দেশের, ভেঙে যাওয়া দেশের সমস্যাটিকে লেখক সপ্তপর্ণে উন্মোচন করতে চেয়েছেন। লেখক বলছেন, দাঙ্গা বেধে যাওয়ার আগে কিন্তু গ্রামেগঞ্জে হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশেই থাকত। কিন্তু ধর্মীয় একতার কারণে মুসলমানেরা ভোট দিত মুসলিম লিগের প্রার্থীকে। তার মানে আমাদের ধরে নিতে হবে— এই ঈশম, যে মনেপ্রাণে কর্তাবাবুদের সম্পদ ও স্বার্থরক্ষায় একনিষ্ঠ, সে কিন্তু ভোটের সময় তার ধর্মীয় সংগঠনের অনুগত।

লেখক এই জটিল সময়কালের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন। ধীরে ধীরে দেখছেন— চারপাশ বদলে যাচ্ছে। গঞ্জে মেলায় দাঙ্গা লাগানো হচ্ছে কাদের উসকানিতে। তা বাড়তে বাড়তে গ্রামের মুসলমানেরাও তাদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। লেখক অতীন নিশ্চয় তাঁরই শৈশবযাপন বাল্যকালের উপলব্ধি 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-র মতো মহাকাব্যিক উপন্যাসের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সেদিক থেকে দেখলে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত লেখাই আত্মজৈবনিক। যে বিপুল বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতা 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'মানুষের ঘরবাড়ি' পেরিয়ে 'সমুদ্রযাত্রা'-য় 'অলৌকিক জলযান' হয়ে পুনরায় শহরের জীবনযন্ত্রণায় এসে সম্পূর্ণ হবে।

এক ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা ও আমৃত্যু অস্থিরতা লেখক অতীন বয়ে বেড়িয়েছেন। শৈশবের নদী মাঠ জলের উদার বিস্তৃত হৃদয় ক্রমেই সংকুচিত হয়ে এসেছে— যত দিন গেছে। দেশভাগ ও দেশত্যাগের প্রত্যক্ষ আঘাত সহ্য করেছেন, দেখেছেন— আবার শূন্য থেকে শুরু করার আকুলতা। উদ্‌বাস্তু কলোনিতে এসে ছিন্নমূল মানুষগুলোর হঠাৎ করে স্বার্থপর হয়ে পড়া, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ হয়ে ওঠা। এসবই তো চোখের সামনে দেখছেন লেখক— তাই বার বার নিরুদ্দেশ হয়ে যান আর বেকারত্বের তাড়নায় যাযাবরের মতো জীবন বেছে নেন।

তারপর অলৌকিক জলযানের শুরুর সেই দিন— ১৭ মে ১৯৫৩, কলকাতার জাহাজঘাট। জাহাজি ট্রেনিং নেওয়ার পর সোনা নামের তেরো-চোদ্দো বছরের তরুণ 'মাসতার' দিতে দিতে একদিন 'এস-এস সিউল ব্যাংক' নামের একটি পুরোনো জাহাজ পেয়ে যায়। সমুদ্রে ভেসে পড়া সামান্য কোলবয়ের কাজ নিয়ে। সমাজসংসারবিচ্যুত এক ভিন্ন জগতে প্রায় সারাপৃথিবী ভ্রমণ। বাস্তবে লেখক অতীন্দ্রশেখরও প্রায় উনিশ মাস জাহাজে চাকরি করেছেন।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার জগৎ ও প্রেক্ষাপট যে কী বিস্তৃত ছড়ানোছিটানো, তা এই ভূমিকাতে অল্পস্বল্প আঁচ পাওয়া যাবে। আসলে বাংলাভাষার কোনো উপন্যাসিকের উপন্যাসই এত বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে রচিত নয়। তারাশঙ্কর, বিভূতি, মানিক— এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ই একটি নির্দিষ্ট সীমা বা অঞ্চলকেই বেছে নিয়েছেন। অমিয়ভূষণ মজুমদারের উত্তরবঙ্গ, ওয়ালীউল্লাহ্ ও ইলিয়াস পটভূমি হিসেবে বেছেছেন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম বা ঢাকা শহর। কিন্তু অতীন!— বাংলাদেশের বিস্তৃত নদী, মাঠ, বিল পেরিয়ে দেশভাগের পর উদ্‌বাস্তু হয়ে এপার বাংলা, শহরতলি, কলকাতা— তারপর সমুদ্রযাত্রা, পুনরায় শহরে প্রত্যাবর্তন। ফলে অতীনের লেখার বিষয় ও চরিত্র অনেক বেশি বিচিত্রতা এনেছে বাংলা কথাসাহিত্যে— এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সেইসঙ্গে তাঁর চরিত্র নির্মাণের নিপুণতা— যে-নৈপুণ্যে নিখুঁতভাবে উঠে এসেছে ঈশম, ফেলু, আকালু, সামসুদ্দিন, পরান, মবারক, পিলু, জ্যাক, বুড়ি, রসো, আবু, ঠাকুরদা, জোটন, ফকির সাব, জালালি, জব্বর ...। প্রতিটি চরিত্রই জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

দুই

লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার আড়াই হাজার থানার অন্তর্গত রাইনাদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম ১৯৩০ নাকি ১৯৩৪? লেখক নিজে জানাচ্ছেন, "বড়ো পিসিমার স্মৃতিতে ঠিক হয়ে আছে আমি জন্মেছি ১৩৩৭ সালের (১৯৩০) বাইশে কার্তিক। ... তাহলে বোঝাই যায় আমার প্রবেশিকা পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করেন মুড়াপাড়া হাই স্কুলের প্রধানশিক্ষক। এবং তখনই আমার জ্যাঠামশায়ের আদরের ভাইপোটির জন্মদিন ঠিক হয়। প্রশ্ন: আপনার ভাইপোর জন্মতারিখ কবে?

জ্যাঠামশাই চোখ বুজে নাকি বলেছিলেন, আরে সেদিন তো হল, কত হবে। চোদ্দো, পনেরো। লিখে দেন চোদ্দো। জন্মসাল কাগজে কলমে হয়ে গেল ১৪ বছরের হিসেবে ১ মার্চ, ১৯৩৪।"

পিতা অভিমন্যু ভৌমিক, মা লাবণ্যপ্রভা দেবী। কিন্তু জ্যাঠামশাই ফর্মপূরণের সময় অতীন্দ্রশেখর ভৌমিকের জায়গায় নাম করে দেন অতীন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। যৌথ পরিবারে তাঁর শৈশব কৈশোর অতিবাহিত। সোনার গাঁ পানাম স্কুল থেকেই দেশভাগের পর ১৯৪৭ সালে টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসেন। ১৯৪৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সুরেন্দ্রনাথ কলেজে আই.কম. ভর্তি হলেও ১৯৫০ সালে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে আই.কম. পাস করেন।

কাশিমবাজারের মণীন্দ্র কলোনিতে কিছুকাল বাবা-মার সঙ্গে ছিলেন। তারপর প্রায় যাযাবরের মতো অস্থির জীবন কাটিয়েছেন। ১৯৫২ সালে কোলবয়ের চাকরি নিয়ে সমুদ্র সফর— ফিরে আসেন ১৯৫৪ সালে। লেখক লিখেছেন: "কখনও আলমবাজার জুট মিলে ফুরনে তাঁতের কাজ, কখনও বরানগর থেকে বড়বাজারের চা-স্টলে, গঙ্গার তীরে তীরে ধূপবাতি বিক্রি, কখনও বোম্বাই শহরে তিলক ব্রিজের নিচে শুয়ে রাত যাপন। ... হালিশহরে ওয়েস্টবেঙ্গল ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স ফোর্সে যোগদান। ট্রেনিং শেষ করে সমুদ্রে চলে গেলাম। জাহাজে সামান্য কোলবয়ের চাকরি এবং প্রায় পৃথিবী বলতে যা বোঝায়, প্রায় বৃত্তাকারে আছে যে পৃথিবী, যার তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল,এক ভাঙা জাহাজে উঠে ঘুরে ফিরে দেখা গেল। ... " ফিরে এসে মুর্শিদাবাদ হাতিনগর প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা ও সেইসঙ্গে কৃষ্ণনাথ কলেজে বি.কম.-এ ভর্তি হন— পাস করেন ১৯৫৬-তে। ১৯৫৮ সালে বাণীপুরে বি.টি. ট্রেনিঙে গিয়ে মমতা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় ও পরে বিবাহ। ১৯৫৮ সালে 'উল্টোরথ' পত্রিকা আয়োজিত উপন্যাস প্রতিযোগিতায় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সমুদ্রমানুষ' মানিকস্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হয়।

বি.টি. ট্রেনিঙের পর সাটুই সিনিয়র বেসিক স্কুলে হেডমাস্টারের চাকরি ১৯৬৩ পর্যন্ত। ১৯৬০-এ প্রথম সন্তান দেবাশিসের জন্ম ও ১৯৬৩-তে শুভাশিসের। ১৯৬৩ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত কলকাতায় এসে কালার প্রিন্টিং অ্যান্ড হলোওয়ার্স কোম্পানিতে ম্যানেজারের চাকরি নেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত 'রামায়ণী প্রকাশ ভবন' নামে এক প্রকাশনা সংস্থার উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৭৬ থেকে 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকার সাব-এডিটর পদে যোগ দেন। ১৯৯৪ সালে অবসর নেন। ২০১৯ সালের ১৯ জানুয়ারি কলকাতায় এই লেখকের মৃত্যু হয়।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস— 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'মানুষের ঘরবাড়ি', 'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান', 'জনগণ', 'আবাদ', 'দুই ভারতবর্ষ', 'নগ্ন ঈশ্বর', 'দেবী মহিমা', 'টুকুনের অসুখ', 'সমুদ্রযাত্রা', 'পঞ্চযোগিনী' ইত্যাদি। মণিমুক্তোর মতো অজস্র ছোটোগল্প লিখেছেন এই লেখক। যেমন— 'ফকরা নিশি', 'কাফের', 'দেবী নিধন পালা', 'বেলকুঁড়ি', 'হেঁসোতে ধার ঠিক আছে', 'পোকামাকড়েও খায়, বাঁচে', 'সাদা অ্যাম্বুলেন্স', 'মাশুল' প্রভৃতি।

সাহিত্যসৃষ্টির জন্য জীবনে বহু সম্মান পুরস্কার পেয়েছেন। 'পঞ্চযোগিনী' উপন্যাসের জন্য ভুয়ালকা পুরস্কার, 'দুই ভারতবর্ষ'-এর জন্য বঙ্কিম পুরস্কার, 'পঞ্চাশটি গল্প'-এর জন্য সাহিত্য অকাদেমি, 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের জন্য সুরমা চৌধুরী মেমোরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ইন লিটারেচার অ্যান্ড জার্নালিজম ইত্যাদি।

তিন

দেশভাগ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা নিয়ে বাংলাভাষায় গল্প-উপন্যাস খুব কম লেখা হয়নি। অনেকেই একটা সময়ের দায় থেকে তাঁদের আখ্যানের ভেতর গুঁজে দিতে চেয়েছেন এই সমস্যাকে— তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ওই বীভৎসতার ভেতর থেকেই নির্মাণ করেছেন জীবনকে। কিন্তু সকলের লেখার ভেতর দেশভাগের যন্ত্রণা তত মর্মন্তুদ হয়ে ওঠেনি বা দাঙ্গার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়নি। যাঁদের সাহিত্য এর ব্যতিক্রম— যাঁরা সার্থকভাবে মূল সমস্যাটিকেই গল্প-উপন্যাসের কেন্দ্র করে তুলেছেন— তাঁদের মধ্যে অন্যতম অসীম রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বা প্রফুল্ল রায়।

দাঙ্গার বীভৎসতাকে ঢেকে দেওয়ার জন্য একপ্রকার হালকা আবরণের মতো সম্প্রীতির কথা অনেকেই জুড়ে দিতে চেয়েছেন— কিন্তু দাঙ্গার প্রকৃত সত্যটিকে সার্থকভাবে ধরতে পেরেছেন কেবল অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর গল্প-উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান চরিত্রগুলি যৌথ গ্রামজীবনে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে অথচ তারা তাদের ধর্মীয় স্বার্থকে এতটুকু ভুলতে পারে না। মানবিকতাকে কখনো কখনো হিংস্রতা এসে তছনছ করে দেয়, যেন ওই উদার আকাশ, মাঠ, বিলের বিস্তারকে হার মানায় ধর্মীয় বিভেদ। লেখক অতীন বলেছেন: "যেহেতু দেশভাগ আমার ঘিলুতে করাত চালিয়েছে— টের পাই ধর্মান্ধতা কী বীভৎস। দাঙ্গার সময় সে বিপর্যয়কারী দানব, সে কখনও গলা টিপে হত্যা করতে চায় ভালোবাসা।" ('ঈশ্বরের সন্ধানে')।

দীর্ঘদিনের লালিত মানবিক টান আর ধর্মীয় বিদ্বেষ কী অবিমিশ্র রূপ নিতে পারে, তা 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে বা 'কাফের'-এর মতো গল্পে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে ঈশম সেখের মতো হতদরিদ্র মুসলমান যে নিজেকে বিস্মৃত হয়ে সম্পন্ন হিন্দুর স্বার্থরক্ষায় জীবন সমর্পণ করেছে, এখানেই সামসুদ্দিনের মতো বিবেকবান মুসলমান যুবক ধর্মের নামে দেশ চায়— ধর্মীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়, কিন্তু একটা দ্বিধায় ভোগে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত লেখাই আত্মজৈবনিক। যে বিপুল বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতা 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'মানুষের ঘরবাড়ি' পেরিয়ে 'সমুদ্রযাত্রা'-য় 'অলৌকিক জলযান' হয়ে পুনরায় শহরের জীবনযন্ত্রণায় এসে সম্পূর্ণ হবে।

শেষপর্যন্ত, এখানেই জব্বরের মতো দানব ওই টালমাটাল বিক্ষুব্ধ সময়ের সুযোগ নেয়— হিন্দু বিধবা মালতীকে লুণ্ঠন করে তাকে ধর্ষণ করে ফেলে যায় কবরভূমিতে, আবার সেই ইসলাম ধর্মেরই হতদরিদ্র জোটন ও ফকির সাব অজ্ঞান মালতীকে শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলে। এই বৃত্ত নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে। সাহিত্যিক দেবেশ রায় যথার্থই বলেছেন, "অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসটিতে খুব গোপনে এক ব্রতপালনের দিকে আমাদের ঠেলে দেওয়া হল— নীরবতা যদি ভাঙতে হয় তাহলে বেঁচে থাকার সেই একটি সমবায়কে, টুকরো সব সমাজকে, বিচ্ছিন্ন ধর্মকে পুনর্নির্মাণ করতে হবে গল্প-উপন্যাসে।" ('পুরাণ থেকে পুরাণ', 'উপন্যাস নিয়ে')

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে— সেদিনের পরিস্থিতিতে মুসলিম লিগের ধর্মের নামে দেশ চাওয়া কি অন্যায় দাবি ছিল? এই প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে প্রশ্নের উত্তরে লেখক নির্মোহভাবে প্রকৃত অবস্থানটি তুলে ধরেছেন: "ওদের চাওয়াটা অত্যন্ত সঙ্গত ছিল, মুসলমানরা আর্থিক দিক থেকে হিন্দুদের চেয়ে অনেক কম সম্পন্ন ছিল। এইজন্য তারা আর্থিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছে। পূর্ববঙ্গে জমিজমার অধিকাংশই ছিল হিন্দু মালিক এবং তারা প্রজাদের ঠকিয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে মুসলমান প্রজারা বেশি ঠকেছে।"

ওই সাক্ষাৎকারেই লেখক একটা অসামান্য কথা বলেছেন, "একজন লেখক তার সম্প্রদায়ের হয়ে লিখতে পারে না। তাকে সবার হয়ে লিখতে হয়।"— এই কথাটি যে কত যথাযথ তাঁর নিজের সাহিত্য সম্পর্কে, তা বোঝা যায় 'কাফের' গল্পটি পড়লে। মুসলমানদের অত্যাচারে হিন্দুদের গ্রাম জ্বলছে, হিন্দুরা সকলেই প্রায় পালাচ্ছে। যুবতীদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরান তার স্ত্রীর নাম ধরে ডাকছে আর একদল মানুষ হাতে মশাল নিয়ে ছুটে আসছে হাতে অস্ত্র নিয়ে। পরান কিন্তু বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় ছুটে গেল এক মুসলমান বন্ধুর বাড়িতেই—

ওই সাক্ষাৎকারেই লেখক একটা অসামান্য কথা বলেছেন, "একজন লেখক তার সম্প্রদায়ের হয়ে লিখতে পারে না। তাকে সবার হয়ে লিখতে হয়।"— এই কথাটি যে কত যথাযথ তাঁর নিজের সাহিত্য সম্পর্কে, তা বোঝা যায় 'কাফের' গল্পটি পড়লে।

হাসিম আর জাবিদা। এসে বলল, "আমি পরাইন্যা, আমারে বাঁচা তুই। যদি মারতে ইচ্ছা যায় তবে মাইরা ফ্যাল।" তারপর সারাগল্প জুড়ে সেই ভয়ংকর যাত্রা। সেখানে হাসিম পরানকে শহরে ছেড়ে আসার নানা ফন্দিফিকির করেও পরাজিত হয়। তার চোখের সামনেই জলে ডুবে ডুবে যেতে থাকা পরানের মাথা ফুঁড়ে দেয় শলা দিয়ে। তারপর হাসিমকেই তাড়া করে দানবেরা। শিউরে ওঠার মতো গল্প। আসলে এই গল্পগুলোয় শুধু ওপর থেকে চাপানো সহানুভূতি নয়, বরং ফুটে উঠেছে এক নিরপেক্ষ সত্য।

'সমুদ্রমানুষ'-এ মবারক যেমন ধর্মীয় গোঁড়ামির উর্ধ্বে উঠতে পেরেছে। আসলে এ-সবকিছু নিয়েই তো দেশকাল, সর্বোপরি আখ্যান গড়ে ওঠে। অতীনের লেখায় ধর্মীয় দাঙ্গা ও সম্প্রীতি— এই দুই রূপই স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখা যায় বলেই তিনি একজন মহৎ কথাকার।

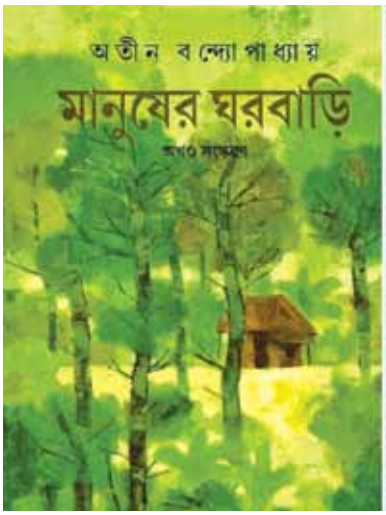

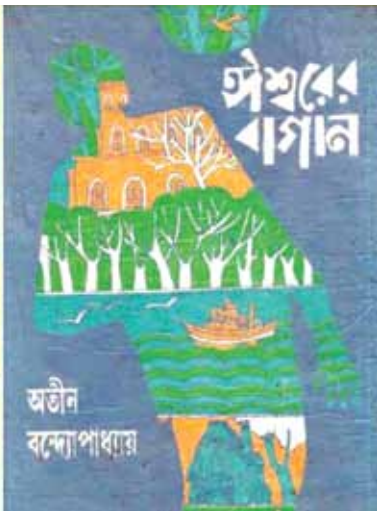

চার

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসের মূল ভিত্তিগুলি হল— দারিদ্র্য, হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব-সমন্বয় আর সমুদ্র। দরিদ্র গ্রাম্য জীবনকে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন বিভূতিভূষণ— তবে সেই চিত্র ততখানি রূঢ় হয়ে ওঠেনি— ব্যতিক্রম 'অশনিসংকেত'। মানিক তাঁর গল্প-উপন্যাসে দারিদ্র্যকে এক তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। শহুরে নিম্নবিত্ত জীবনের রূপকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র। কিন্তু অতীন এ-ক্ষেত্রে একেবারে মৌলিক। দারিদ্র্য তাঁর গল্প-উপন্যাসে নিঃস্ব মানুষকে একেবারে নগ্ন পাশবিক করে তুলেছে— তার পাশাপাশি লেখক মানবিকতার চিত্র এঁকেছেন।

'ফকরা নিশি' গল্পে পথ হারানো তপুকে নির্জন মাঠে পেয়ে ফকরা তাকে ঘর পৌঁছে দিতে চায়— তার চেহারা পোশাক দেখে তপু বেজায় ভয় পেলেও ফকরা তাকে ছেড়ে যায় না— কেননা, তপুকে বাড়ি পৌঁছে দিলে সে বইনদির কাছে পেট ভরে খাবে— সে কতদিন পেট ভরে খায়নি। ফকরা "অনেক খায় বলে, অথবা পেট ভরে খেতে পাবে জেনে মনের সুখে অন্ধকার মাঠে সে গান জুড়ে" দেয়। কী মানবিক দৃষ্টান্তের একটি গল্প এই 'ফকরা নিশি'।

পাঠকের মনে পড়বে 'মাশুল' গল্পে জোটনের ক্ষুধাতুর রূপটির কথা, আর তার সেই ক্ষুধার্ত চোখের সামনে পরিপাটি বসে ফকির সাবের শুঁটকি-মাছ-মাখা দিয়ে তৃপ্তি ভরে ভাত খাওয়ার দৃশ্য। তিনি যেন কতদিন ভাত খাননি আর জোটন তো কতদিন শাপলা শালুক খেয়ে আছে: "তিনি সে ভাতটাও পরিপাটি করে শেষ করলেন। এবং ভাতের অপেক্ষায় ফের বসে থাকলেন। সহসা আবিষ্কারের ভঙ্গিতে তিনি মাদুরের এবং সানকির সংলগ্ন ভাতটিও আঙুলের চাপে তুলে মুখে দিয়ে বসে থাকলেন। ... এইসব জোটন ঘরের ভেতর থেকে লক্ষ করে শরমে মরে যাচ্ছে। সে হাঁড়ির ভেতর হাত দিল। শেষ দুমুঠো ভাত সানকিতে তুলে শেষ ভর্তাটুকু তার কিনারে রেখে মাদুরের ওপর রেখে দিল।"

কিংবা ক্ষুধার জ্বালায় প্রায় পশু হয়ে যাওয়া জালালির জলে ডুবে মালতীর হাঁসকে গলা টিপে মেরে আনা বা শালুক তুলতে গিয়ে বিলের জলে ডুবে মরার সেই মর্মান্তিক দৃশ্য: "পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, জ্বালা মরে না জলে। জলের ভেতর ভেসেছিল জালালি, যেন নেমে গেলেই পেটের জ্বালা নিবারণ হবে। কিন্তু হায় জলের ভিতর কাদার ভিতর কোথাও শালুকের নাম গন্ধ নেই। রোজ রোজ তুলে নিয়ে গেলে কি আর থাকে!"

এইসব দৃশ্যে আসলে দারিদ্র্য মানুষকে মহান করে তুলছে না— বরং আরও সংকীর্ণ, লোভী, পশুর মতো হিংস্র করে তুলছে। লেখক অতীন

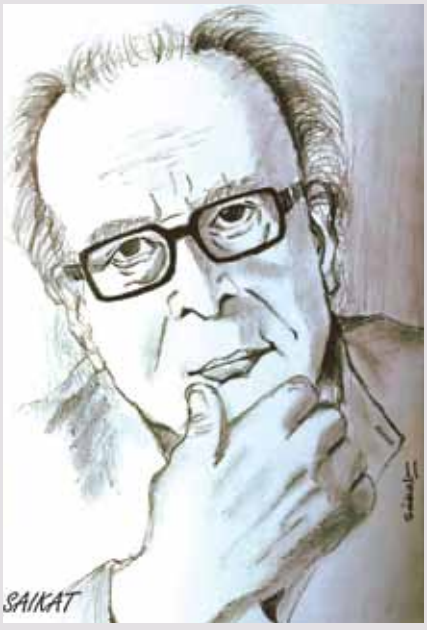

দরিদ্র গ্রাম্য জীবনকে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন বিভূতিভূষণ— তবে সেই চিত্র ততখানি রূঢ় হয়ে ওঠেনি— ব্যতিক্রম 'অশনিসংকেত'। মানিক তাঁর গল্প-উপন্যাসে দারিদ্র্যকে তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। শহুরে নিম্নবিত্ত জীবনের রূপকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র। কিন্তু অতীন একেবারে মৌলিক। দারিদ্র্য তাঁর গল্প-উপন্যাসে মানুষকে নগ্ন পাশবিক করে তুলেছে— পাশাপাশি লেখক মানবিকতার চিত্র এঁকেছেন।

এ-ক্ষেত্রে চরম বাস্তববাদী এক কথাকার— রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি এসে তার দেখাকে বা সেই সময়ের প্রকৃত বাস্তবকে আচ্ছন্ন করে ফেলেনি।

পাঁচ

সমুদ্রযাত্রা ও জাহাজ, বন্দর বিষয়ে বাংলাভাষায় রচিত গল্প-উপন্যাসের পথিকৃৎ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়কে অবলম্বন করে তিনি অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছেন— সেগুলির মধ্যে শিল্পোৎকর্ষে অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'অলৌকিক জলযান'। লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে এখানে চমৎকার ব্যবহার করেছেন। সমুদ্রযাত্রার একঘেয়েমি, বিষণ্ণতা, আবার জাহাজের নানা খুঁটিনাটি কাজ— নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন লেখক— এই ডেটেলিং তাঁর উপন্যাসের আখ্যানকে বিশ্বস্ত করে তুলেছে পাঠকের কাছে। 'সমুদ্রমানুষ'-এ লেখক শেখরের কষ্টকর কাজের বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে: "শেখর হুম হুম করে কয়লা মারছে দু'নম্বর বয়লারের তিন নম্বর চুলোতে। বারবার করে ত্রিশ সের ওজনের স্লাইস টানতে গিয়ে মোচড় দিয়ে উঠছিল হাতের নরম পেশিগুলো। অন্য আগরওয়ালাদের পোড়া কয়লা টানা শেষ। ... কিন্তু শেখরের বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, উইন্ডস হোলের নিচে বসে মুহূর্তের জন্য হাওয়া খেতে পারল না। ঘাম আর ছাইয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে মুখ। পোড়া কয়লার ছাইয়ে ঢেকে গেছে চোখ।"

'অলৌকিক জলযান' উপন্যাসে সিউল ব্যাঙ্ক জাহাজের কাপ্তেন বৃদ্ধ হিগিনসের পরিণতি বড়ো মর্মবিদারক। অচল ওই জাহাজটিকে নিয়ে তিনি আর বন্দরে ভিড়তে চান না। নীল আকাশের নীচে ঘুরে ঘুরে কখনো অন্ধকারে অথবা সাদা জ্যোৎস্নায় অজানা সমুদ্রে ভেসে যেতে থাকে জাহাজ। একে একে সবাই ছেড়ে যায় জাহাজ। কাপ্তানের মেয়ে বনি আর ছোটোবাবু শেষ বোটে জাহাজ ছেড়ে জীবনের দিকে চলে আসে আর বৃদ্ধ সারেঙ আর হিগিনস নিয়তিকে ভাসমান জাহাজের মধ্যে সমর্পণ করেন। এই করুণ এক দৃশ্য দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হচ্ছে। এই উপন্যাসের ভাষাও যেন এক মায়াবী রূপ নিয়েছে।

ছয়

যদিও লেখক অতীন বার বার বলেছেন— তাঁর সচেতন কোনো গদ্যভাষা নেই। তিনি সহজভাবে লিখতে চান এবং এ-ক্ষেত্রে তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসারী। সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ও মন্তব্য করেছেন যে, অতীন স্বতঃস্ফূর্ত লেখক। তা সত্ত্বেও তাঁর কয়েকটি গল্প-উপন্যাসে ভাষা এত চমৎকার, রূপময় ও কাব্যিক হয়ে উঠেছে, অথচ তা বাস্তবতা থেকে ন্যূনতম বিচ্যুত হয়নি। পাঠক হিসেবে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না সে ভাষা ও কাহিনি নির্মাণের শিল্পে। অশোক মিত্রের মতো বিদগ্ধ পাঠক বা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মতো সুসাহিত্যিকও এই ভাষা নিয়ে তাঁদের মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন।

উপন্যাসের নন্দন, তার গঠনরূপ নিয়ে তর্কবিতর্কের শেষ নেই। আমরা জানি যে, সাহিত্যের অন্যান্য ধারাগুলির মতো উপন্যাস তত প্রাচীন নয়। হয়তো সেই কারণেই কবিতা, নাটকের মতো উপন্যাসের কোনো স্থিরীকৃত মডেল আমরা পাইনি। এই প্রসঙ্গে আসে অন্য এক প্রসঙ্গও। পাশ্চাত্যে বা লাতিন আমেরিকার দেশগুলির জীবন ও সমাজ যত চলিষ্ণু অর্থাৎ ঝোড়ো হাওয়ায় তছনছ হয়ে যাওয়া তাদের জীবন, তাতেই হয়তো উপন্যাসের নির্মাণ সার্থক হয়ে উঠতে পারে। বঙ্গজীবনের গতিহীনতা— নদী-নালা-মাঠ-বিলের মতো ধীর শম্বুকগতির জীবন আমাদের। এই জীবনকে অবলম্বন করেই বাংলা উপন্যাসের যে-গড়ন তৈরি হয়েছে, তাও বিশ্বমানের হয়ে উঠেছে কখনোসখনো। সে গড়ে নিয়েছে তার নিজস্ব ধাঁচ। যে-ধাঁচ আমরা শরৎ-রবীন্দ্রনাথে নয়, বরং খুঁজে পাই তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকটাই বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্করের পথেই চিন্তাশীল নির্মাণকে সরিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত জীবনকেই বেছে নিয়েছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। তিনি কিছুই প্রায় নির্মাণ করেননি। যা সহজাত, স্বাভাবিক তাকেই যথাযথভাবে চিত্রিত করেছেন। ফলে তাঁর গল্প-উপন্যাসে বিচিত্র চরিত্রের ভিড়— ঈশম, সোনাবাবু, ফতিমা, জোটন, মবারক, ফেলু, জ্যাক, সারেঙ— সব চরিত্রই তাঁর জীবনে চোখে দেখা চরিত্র। তারা তাদের নিজস্ব ভাষাভঙ্গিতেই কথা বলে ওঠে। এই বিপুল অভিজ্ঞতা তাঁর রচনায় পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তবে পুনরাবৃত্তি মাঝেমধ্যেই তাঁর সাহিত্যপাঠে একঘেয়েমি এনে দেয়। অনেক গল্পই তাঁর উপন্যাসের কোনো অংশমাত্র বা অনেক গল্পই তাঁর উপন্যাসের বীজক্ষেত্র— এভাবে বলা যায়। চরিত্রগুলি ঘুরেফিরে আসে— তাদের জীবনসংগ্রাম, বহমান নদীর মতো, প্রকৃতির মতো। তিনি যদি আরেকটু নির্মাণে পটু হতেন হয়তো এত এত লেখার বদলে পেতাম তুলনায় অল্প এথচ আন্তর্জাতিক মানের উপন্যাস। সে-আক্ষেপ পাঠক হিসেবে আমাদের থাকবে।

অবশ্য তাতে বিচিত্র জীবনের কথাকার চিত্রকর হিসেবে তাঁর মূল্য এতটুকু কমে না। তিনি বাংলাভাষার সেই মহৎ লেখক অতীন্দ্রশেখর, যিনি ঈশ্বরের খোঁজে সারাজীবন ঘুরে বেড়িয়েছেন এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্ত, খুঁজে পাননি। বুঝেছেন শেকড়হীন মানুষের ঈশ্বর থাকে না। উপলব্ধি করেন— "বেঁচে থাকা টিকে থাকা মানুষের পক্ষে বড়ো জরুরি। সবাই মিলে টিকে থাকা আরও জরুরি।" ■

নবনীতা দেবসেন আর নেই। তাঁর যাপন-পরিধি ছিল বিশ্বজোড়া। শৈশব থেকে শুধু দেশে নয়, বিদেশেও এমন পরিমণ্ডলে তাঁর বেড়ে ওঠা যে, তাঁর সৃষ্টি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশ-কালের বাধা অতিক্রম করতে চেয়েছে। তীব্র ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি আধুনিক মানুষের বেঁচে থাকার আনন্দ আর বিষাদগুলি। এই লেখাটি তাঁকে আমাদের স্মরণপ্রচেষ্টা।

শূন্য হয়ে এল ‘ভালো-বাসা’র বারান্দা

পার্থজিৎ চন্দ

একটি লেখার শেষে পাদটীকা পড়ে একজন লেখককে কতটা আবিষ্কার করা যায়?

পাদটীকা অবশ্যই একটি লেখার গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। প্রয়োজনীয় না হলে পাদটীকা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু নবনীতা দেবসেনের মতো একজন সাহিত্যিক, সাহিত্যের প্রতিটি শাখাতেই যাঁর অবাধ বিচরণ, যিনি প্রায় দু-হাতে লিখেছেন, উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর ভাণ্ডার, তাঁর মতো একজন সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মকে চিনে নিতে একটি পাদটীকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে?

সেইমাত্র সোস্যাল মিডিয়ায় নবনীতা দেবসেনের মৃত্যুর খবর আছড়ে পড়তে শুরু করেছে। অনেকেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন। অনেকের লেখাতেই ফিরে ফিরে আসছে নবনীতার সঙ্গে তাঁদের কাটানো সময়ের সুখস্মৃতি। সংগত কারণেই অনেকে শোকে মুহ্যমান।

আমার হাতে তখন উঠে এসেছে নবনীতার একটি গল্পসংগ্রহ। আমার সঙ্গে তাঁর ‘ব্যক্তিগত’ পরিচয় ছিল না। যেটুকু পরিচয় তা তাঁর লেখার সঙ্গেই। আমি জীবনে তাঁকে মাত্র দুই-তিন বার সামনে থেকে দেখেছি। দেখেছি গাম্ভীর্যের মুখোশ না-পরে থাকা একটি মুখ। উজ্জ্বল দুটি চোখ। এর বেশি আর-কিছুই নয়। তাঁর সঙ্গে কথা বলবার মতো সাহস হয়ে ওঠেনি কোনোদিন। যদিও শুনেছিলাম তিনি তরুণ কবিদের প্রশ্রয় দেন। কিন্তু স্বভাবসংকোচে আমার আর তাঁর সঙ্গে কথা বলা হয়ে ওঠেনি।

তাই তাঁর চলে যাবার দিনে, আমার কাছে তাঁর সব থেকে বড়ো উপস্থিতি তাঁর লেখা। একের পর এক গল্পের পাতা উলটে যাচ্ছিলাম। খুব যে মন দিয়ে পড়তে পারছিলাম তাও নয়। ‘উত্তরকাণ্ড’ নামে তাঁর একটি গল্পের পাদটীকায় এসে চোখ আটকে গেল হঠাৎ। রামায়ণ-আশ্রিত এই গল্পে কাহিনির বিনির্মাণ করেছিলেন নবনীতা। আধুনিক এক ভাষ্যে কথা বলেছিলেন তিনি। মৃদু শ্লেষ আর কলমের নিপুণ মোচড়ে তিনি চুরমার করে দিচ্ছিলেন পিতৃতন্ত্র থেকে শুরু করে শাসক-সংলগ্ন হয়ে থাকা ক্ষমতার কেন্দ্রটিকে। পৃথক এক ডিসকোর্স গড়ে উঠতে শুরু করেছে গল্পটির ভেতর দিয়ে। পাদটীকায় নবনীতা লিখছেন, “এই কাহিনির বীজ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ‘মেচ’ উপজাতির লোকগাথা রামকথা থেকে নেওয়া। সেখানে লক্ষ্মণ গোমাংস খেয়ে মুসলমান হয়ে যান, তাঁর হাসান-হোসেন নামে দুই পুত্র জন্মায়। লব-কুশ তাদের আক্রমণ করতে হাসান হোসেন যুদ্ধে নিহত হয়। এখানে দ্রষ্টব্য যে, এই লক্ষ্মণপুত্র হাসান-হোসেন কিন্তু হজরত-নবীর দৌহিত্রদ্বয় নয়। এরা লৌকিক কল্পনায় সৃষ্ট চরিত্রমাত্র। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, এই লক্ষ্মণ রামায়ণের সহমর্ম হলেও লক্ষ্মণের দুই পুত্রের সঙ্গে কোনোক্রমেই হজরত-নবীর দৌহিত্রদ্বয়ের যোগ নেই।” নবনীতা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। শারীরিকভাবে তিনি চলে গেছেন, সত্য। কিন্তু

সেদিনের নবনীতা-অমর্ত্য।

তিনি কোন ভারতবর্ষের ছবি দেখেছিলেন আজীবন, কোন ঐতিহ্য বহন করেছিলেন মনে মনে, এই পাদটীকা তার সব থেকে প্রামাণ্য চিত্র বহন করে চলেছে।

শাশ্বত ভারতের লুপ্তপ্রায় আধুনিক যে গুটি কয়েক বাঙালি লেখক-শিল্পী আমাদের অনেকদিন আলো দিয়ে গেলেন, নবনীতা ছিলেন তাঁদের একজন।

তিনি বাঙালি হিসেবে জন্মেছিলেন। বেঁচে ছিলেন ভারতবর্ষের বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে। এবং শিকড় অটুট রেখে তিনি অর্জন করেছিলেন এক আন্তর্জাতিকতা। নবনীতা দেবসেন সম্পর্কে এ-কথা বলাই যায়। তিনি সমসময়ে বিখ্যাত কবি, পেয়েছিলেন দেশি-বিদেশি নানা পুরস্কার। দু-হাতে গদ্য লিখেছেন। জনপ্রিয়তায় তিনি সবসময়েই থেকেছেন সামনের সারিতে। গল্প-উপন্যাস-ভ্রমণকাহিনির পাশাপাশি রম্য-রচনায় তিনি মাতোয়ারা করে দিয়েছেন পাঠককে। অধ্যাপনার জীবনে তিনি পড়াতেন তুলনামূলক সাহিত্য। এসব উল্লেখযোগ্য পালক তাঁর মুকুটে, সন্দেহ নেই। কিন্তু সব থেকে উল্লেখযোগ্য মনে হয় নবনীতার আন্তর্জাতিকতা। তিনি সেই গুটি কয়েক বাঙালির মধ্যে একজন, যিনি আদ্যন্ত আন্তর্জাতিক হয়েও নিজের শেকড়ের প্রতি আস্থাশীল। জীবৎকালেই তিনি কিংবদন্তীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। কারণ, তাঁর হাত ধরে বাঙালির মেধা ও মননচর্চার জগতে ঢুকে পড়েছিল বেশ কয়েকটি বিষয়।

নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবীর কন্যা হিসেবে তিনি জন্ম থেকেই বহন করেছিলেন এক বিরল বৈদগ্ধের উত্তরাধিকার। খুব অল্পবয়সে কাছ থেকে দেখেছিলেন সে-সময়ের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের। মূলত সাহিত্যিক বাবা-মা-র কারণেই তাঁর ছোটোবেলায় ঐতিহ্যের প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধা জন্মায়। কিন্তু এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তাঁকে আধুনিকতাকে বরণ করে নিতে কোনো বাধা দেয়নি।

নবনীতা বাংলা গদ্যকে দিয়েছেন আটপৌরে ঝরঝরে এক আভিজাত্য।

২

নিজের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি লিখছেন, "আজন্ম একলা ঘরে যে মানুষ, সে একাকিত্বে ভয় পায় না। কিন্তু জানি এক দিন বয়স হবে, ব্যাধির প্রতাপ আরও বাড়বে, ক্ষমতা নিবে যাবে, ফাঁকা হয়ে যাবে বৈঠকখানা-ঘর। বার্ধক্যের নিঃসঙ্গতাকেও আমি ভয় করি না, আমার একটাই ভয়, কবিতা যেন আমাকে শেষদিনে পরিত্যাগ না করে।"

কবিতা আজন্ম তাঁর সঙ্গেই থেকেছে। এবং তিনিও নিছক বাকনির্মিতির চর্চা না করে স্বতঃস্ফূর্ততার দিকে ঢলে থেকেছেন আজীবন। তাঁর বিপুল সংখ্যক কবিতার সামান্য অংশের দিকে তাকালেও বোঝা যায়, নির্মাণের জটিলতা তাঁকে কোনোদিন আক্রান্ত করতে পারেনি। স্বতোৎসারিত উচ্চারণেই তাঁর আস্থা ছিল সব থেকে বেশি। যেকোনো শিল্পের ক্ষেত্রে নির্মাণের ভূমিটিকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আবার এটিও ঠিক যে, সেই শিল্পই হয়তো দেশকালের বেড়াজাল ভেঙে ফেলতে সমর্থ হয়, যা এক স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে উঠে আসা।

আধুনিক মানুষের পারাপারহীন একাকিত্ব বিষাদ নিরাপত্তাহীনতার তীব্র এক শ্বাসরোধী বোধ খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন নবনীতা। দেখেছিলেন পাশ্চাত্যের চোখ-ধাঁধানো বৈভব। উদ্দাম ও উচ্ছল জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমশ অস্তিত্বের সংকটে ভুগে চলা মানুষ। এ-প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, বাঙালি লেখকদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লেখকই নবনীতার মতো পৃথিবীর এত দেশ দেখেছেন। নবনীতার তীব্র ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি আধুনিক মানুষের বেঁচে থাকার চারপাশে ছড়িয়ে থাকা আনন্দ ও বিষাদগুলি।

নবনীতার কবিতার অন্দরমহলে কিছুক্ষণ কাটালেই বোঝা যায় এ-সভ্যতার ধ্বংসাত্মক রূপ নবনীতার কাছে অপরিচিত নয়। কিন্তু নবনীতা আধুনিকতার অমোঘ উপসর্গ, অ্যানার্কিজম বা নৈরাজ্যবাদীতা, যে-নামেই ডাকা হোক, তাকে বেশি গুরুত্ব দেননি। আবার কবিতায় যাজকদের মতো কল্প এক 'শুভবোধ'-কে জোর করে প্রবেশ করিয়ে দিতেও চাননি। যা দেখেছেন তাই লিখেছেন। মানুষের বেঁচে থাকাই এক বর্ণচ্ছটা নিয়ে জেগে থাকা মহাজাগতিক বিস্ময়। নবনীতা সে-দিকে চেয়ে থেকেছেন। গা-ছমছম করে ওঠে নবনীতার এক-একটি লেখা পড়ে। নূন্যতম আয়োজনে তিনি এঁকে রেখেছেন সময়দানবের পেটের ভেতরে মানুষের বেঁচে থাকাকে—

'এ-রাজ্যে বিকেল নেই।
নীরন্ধ্র দুপুর সব বিবর্ণ রাত্রির তীরে ডোবে
অল্পস্বল্প সকাল গড়ায়
তারপরই পায়াভারী বিষম দুপুরবেলা আসে।

নীরন্ধ্র দুপুর, আর নিদ্রাহীন রাত্রি দ্বিপ্রহর
এই দুই মেরু ছুঁয়ে ছোটো-ছোটো পল-অনুপল
অনর্গল দৌড়োয়
সারি-সারি জরুরি পিঁপড়ে
গর্তের এপারে-ওপারে
বিরামবিহীন।'
('অন্য দেশ')

কী গদ্য কী কবিতায় পুরাণের বিনির্মাণ নবনীতার 'সিগনেচার টিউন'।

নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধা নিবেদন।

আমাদের চারপাশে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা মিথগুলির মধ্যে যে আসলে ধরা রয়েছে পুরুষতন্ত্রের অত্যাচারের চিহ্ন, নিম্নবর্গের মানুষগুলিকে কখনো দানব বা কখনো রাক্ষস নামে চিহ্নিত করে অত্যাচারের পথ প্রশস্ত করা— অনেক সময়ে সেসব আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। নবনীতার কবিতা বার বার আমাদের সামনে সেগুলিকে নগ্ন করে তুলে ধরেছে। পুতনা রাক্ষসীর বুক দাঁতে ছিঁড়ে তাকে হত্যা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। এই কাহিনিটিকে আতসকাচের নীচে রেখে কবিতার সত্যে তাকে দেখতে চেয়েছেন নবনীতা—

‘পুতনা তোমার সত্যি
কোনো দোষ ছিল না কখনো।
তুমি শুধু ভাড়া-করা সামান্য দানবী।

কী ক’রে জানবে তুমি, দেবশিশুদের
আকণ্ঠ রক্তের তৃষ্ণা?
সদ্যোজাত দেবতার ঠোঁটে
তীব্রতর বিষ।

পুতনা, অকৃতকার্য হয়েছিলে বলে
আত্মাতে রেখো না ক্ষোভ—
তুমি তুচ্ছ নশ্বর দানবী।

মৃত্যুহীন দেবতার দাঁতে
মারণাস্ত্র অমোঘ শানানো।
(‘পুতনার প্রতি’)

— কবিতার অন্যতম একটি শক্তি, সে আমাদের নীচু বাস্তবতা থেকে এক উঁচু বাস্তবতার সন্ধান দেয়। সেই কবিই সময়কে অতিক্রম করে চলে যেতে পারেন, যিনি এই সন্ধান দেবার কাজটি করতে পারেন। নবনীতা সেটি পেরেছিলেন। মিথের মধ্যে দীর্ঘদিন বাস করতে করতে আমরা কৃষ্ণের অতি মানবিক শক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ি। পুতনার বুক ছিঁড়ে রক্তপান ও তাকে হত্যা করবার কাহিনিটি আমাদের

কাছে বেশ সহজভাবে ধরা দেয়। ক্রমশ ফিকে হয়ে যেতে থাকে এই ঘটনাটির মধ্যে লুকিয়ে থাকা ‘নৃশংসতা’। দেবশিশুদের যেন অধিকারই জন্মে যায় এভাবে রক্তপান করবার। শুধু পুতনা নিধনের কাহিনিটির দিকেই নবনীতা নিশ্চয় আঙুল তোলেননি। তিনি আঙুল তুলেছিলেন এক প্রবণতার দিকে। যে-প্রবণতা আমাদের সহজভাবে এই রক্তপানের ধারাটিকে মেনে নিতে শেখায়। এবং নবনীতার কবিতা পড়ার পর আমাদের কাছে বিষয়টি আর সহজ থাকে না তেমন।

৩

কবিতায় অকারণ জটিলতার আমদানি করেননি তিনি। বাকনির্মিতির দুর্মর প্রচেষ্টায় আক্রান্ত হননি কোনোদিন। আটপৌরে আদলই তাঁর সব থেকে বড়ো সম্পদ। গদ্যেও ঠিক সেই পথেই চলেছিলেন নবনীতা।

স্মরণসভায় অমর্ত্য সেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্খ ঘোষ।

ধুলোয় ঢাকা, সহজ সুখ-দুঃখকে বুকে আঁকড়ে বেঁচে থাকা এক ভারতবর্ষ বার বার উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। নিবিড় আবেগের এক টলটলে হ্রদ সবসময় জেগে থেকেছে তাঁর শব্দজগতের নীচে। তাঁর মতো স্বাদু গদ্য বাংলায় খুব কম মানুষই লিখেছেন। কতটা স্বাদু ছিল তাঁর গদ্য? বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো করে একটু দেখে নেওয়া যাক। ‘করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে’ নামে এক ভ্রমণকাহিনিতে তিনি লিখেছেন, “এই শীতের অন্তরটিঞ্চুনী দমন করতে যে-উত্তাপ দরকার, তুচ্ছ কম্বলের তা দেবার শক্তি নেই। বৃষ্টিতে চারিদিকের সব ধুনি নিভে গেছে, সব কাঠ ভিজে গেছে। এখন আর খুঁজে পাব না সেইসব ধুনি জ্বালানো সাধুজীদের।” এক নদীর সাবলীলতা নিয়ে যেন বয়ে চলেছে এই গদ্যের ধারা। মনোযোগী পাঠক নিশ্চয় লক্ষ করবেন, কী অসীম সাবলীলতায় তিনি ‘অন্তরটিঞ্চুনী’ শব্দটি ব্যবহার করলেন লেখায়। কুম্ভমেলায় ঘুরে বেড়ানো এক আধুনিক ভারতীয় নারীর চোখে দেখা এই ভ্রমণকাহিনিটি বাংলাসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

মাঝে মাঝে তাঁর শব্দপৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে মাথা নুয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ থেকে কমলকুমার মজুমদার পর্যন্ত অনায়াস যাতায়াত ছিল তাঁর। বার বার লিখেছেন তাঁদের কথা। ঠিক যেমন লিখেছেন, তাঁর ‘ভালো বাসা’র বারান্দায় লতিয়ে ওঠা গাছটিকে নিয়েও। লিখছেন ‘ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে’র মতো লেখা।

রবীন্দ্রনাটক নিয়ে লেখা ‘বজ্রগর্ভ কুসুম: রাজা থেকে রক্তকরবী’ রবীন্দ্রনাটক সম্পর্কিত অতি গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম। এই লেখাটিতে নবনীতা লিখছেন, “দুটি নাটকেরই পরিসমাপ্তিতে রুদ্ধদ্বার যখন খুলে যায়, অহং-এর গর্ব যখন লুটিয়ে পড়ে, উন্মুক্ত দ্বার অবারিত করে দেয় বিশ্বভুবনকে, তখন আকাশে দোলে একটিই রাজপতাকা, সেখানে পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা।” রবীন্দ্রনাটক সম্পর্কে এই মূল্যায়ন রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীটিকে চিনে নিতে অত্যন্ত সহায়ক।

যে-বাঙালি আজও কমলকুমার মজুমদারের প্রতিভার বিস্তার সম্পর্কে উদাসীন, তাঁকে গ্রহণ করা তো অনেক দূরের কথা,

ধুলোয় ঢাকা, সহজ সুখ-দুঃখকে বুকে আঁকড়ে বেঁচে থাকা এক ভারতবর্ষ বার বার উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। নিবিড় আবেগের এক টলটলে হ্রদ সবসময় জেগে থেকেছে তাঁর শব্দ জগতের নীচে।

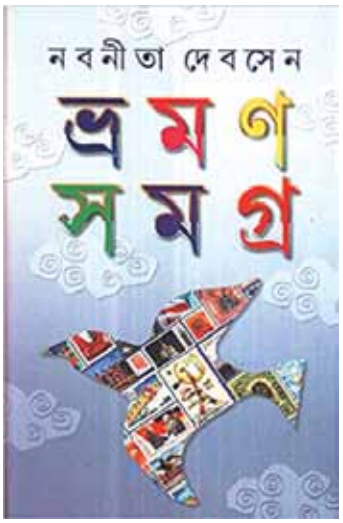

— ওই একই হল আমাদের কাছে ... ”

এই আলাপচারিতার মধ্যে আমরা খান-খান হয়ে যেতে দেখি এক বিদুষী নারীর পৃথিবী। নবনীতার মতো এক বিদুষীর শেষ পরিচয় হয়ে উঠছে তাঁর প্রাক্তন স্বামীর পরিচয়। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। যে-মৌলবাদ আমাদের ভেতর শেকড় ছড়িয়ে বসে আছে, তাকে উপড়ে তোলা যে কত কঠিন, দেখিয়ে দিয়েছিলেন নবনীতা।

নবনীতার গদ্যকে মাঝে মাঝে মনে হয় সুগার-কোটেড পিল। ঝরঝর করে পড়ে ফেলবার পর শুরু হয় তার প্রতিক্রিয়া। মাথার ভেতর কী যেন একটা ঘুরপাক খেতে শুরু করে। একটু একটু করে এক অস্বস্তি গ্রাস করতে থাকে আমাদের। বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়ে যাবে ‘গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ’, ‘ধর্মভাই’, ‘উত্তরকাণ্ড’, ‘চোখ’, ‘ভালোবাসা কারে কয়’, ‘সেদিন দুজনে’, ‘বঁ ভোয়াইয়াজ’-সহ বেশ কিছু ছোটোগল্প।

৪

সেই বাঙালিকে কমলকুমারের পৃথিবী চেনাতে পাতার পর পাতা লিখে গিয়েছেন নবনীতা। ‘একটি মেট্রোপলিটন শিল্পীমন ও মধ্যবিত্ত বিদ্রোহের উদাহরণ’ নামে লেখাটি পড়লে কমলকুমারের পাশাপাশি আরেকটি জিনিসও আমরা জেনে যেতে পারি। কী গভীর জ্ঞান ছিল নবনীতার দেশ-বিদেশের শিল্প সম্পর্কে।

খুব মনোযোগ দিয়ে নবনীতার লেখার ভেতর প্রবেশ করলে দেখা যাবে, সেখানে এক ভারতীয় নারীই অবস্থান করছেন। বার বার সমাজ-পুরুষ-সময় তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করে যাচ্ছে। কিন্তু সে নিজে সর্বংসহা। বুকফাটা একটা আর্তনাদ গলায় আসব-আসব করেও আসছে না। হয়তো কোনোদিনই আসবে না। সে হাসিমুখে সবার আড়ালে চোখের জল মুছে সহ্য করে যাবে সব।

নবনীতার বিপুল সংখ্যক গল্পের মধ্যে সব থেকে বেশি করে এই পৃথিবীটির সন্ধান পাওয়া যায়। ঠিক যেমন এই মুহূর্তে মনে পড়ছে তাঁর ‘জরা হটকে জরা বাঁচকে ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান’ নামে গল্পটি। বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল নবনীতার। বিবাহবিচ্ছেদের পর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ক্ষুণ্ণ হতে দেখেনি কেউ। কিন্তু এই আধুনিক মননের সঙ্গে যেসমস্ত গুল্মসম মানুষ পরিচিত নয়, তারা ব্যক্তিমানুষের অন্দরমহলে উঁকি মারে। এক আধুনিক নারীর মনন ও মেধা বার বার লাঞ্ছিত হয় তাদের হাতে।

অমর্ত্য সেনের নোবেল প্রাপ্তির পর নবনীতাকে যে বিড়াম্বনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, কীভাবে চোরা এক পুরুষতন্ত্র নানা অছিলায় ঢুকে পড়তে চেয়েছে তাঁর পৃথিবীতে, সেটি দেখিয়ে দিয়েছেন নবনীতা। এই গল্পের প্রায় মিথ হয়ে যাওয়া একটি কথোপকথনের দিকে তাকানো যাক—

“— নমস্কার। আপনি তো নবনীতা দেবী?

— হুঁ (সহাস্য) ...

— আমরা আপনার লেখা-টেখা পড়তাম বটে, এখন আরো বড়ো পরিচয় জানলাম। এত বড়ো মানুষের স্ত্রী আপনি। অজস্র অভিনন্দন জানাচ্ছি। দেশের গর্ব।

— স্ত্রী নই। স্ত্রী ছিলাম।

খুব মনোযোগ দিয়ে নবনীতার লেখার ভেতর প্রবেশ করলে দেখা যাবে, সেখানে এক ভারতীয় নারীই অবস্থান করছেন। বার বার সমাজ-পুরুষ-সময় তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করে যাচ্ছে। কিন্তু সে নিজে সর্বংসহা।

নিজের কথা লিখতে গিয়ে নবনীতা আরেক জায়গায় লিখছেন, “জানি, বললে লোকে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যি সত্যিই আমার দু-চোখ দু-রকমের। ডান চোখটা সর্বদা মিটিমিটি হাসে, শোকের বাড়িতেও নির্লজ্জ, সে শুকনো থাকে— আর বাঁ-চোখটা একদম হাসে না, তার গড়নটাই কেমন দুঃখী-দুঃখী।”

এই দু-চোখ দিয়েই তিনি পৃথিবীকে দেখেছিলেন। হাসি-কান্নায় দোল দোলানো এক জীবন। তাঁর নামকরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বলোকের যে শেষ গুটি কয়েক বাসিন্দা, তার মধ্যে নবনীতা ছিলেন অন্যতম। এই সময়ে দাঁড়িয়ে শুধুই মনে হচ্ছে বাঙালি হয়তো বুঝতেও পারল না সে কী হারাল। নবনীতার সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন যে এখনও শুরুই হয়নি প্রায়, সেটা নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া যায়। মাঝে মাঝে সংকটের সময়ে বাঙালি নবনীতার মতো মহিরুহের কাছে আশ্রয় পেয়েছে। পেয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দিশা। যে-সময়ে আরও বেশি বেশি করে প্রয়োজন ছিল তাঁর, সে-সময়েই তিনি চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে। রয়ে গেল তাঁর সৃষ্টির সম্ভার।

ব্যক্তিপুজোর গণ্ডি ছাড়িয়ে এবার সেগুলিকে নিয়ে নিভৃতে বসবার সময় হয়েছে আমাদের। ■

গত চৌত্রিশ বছরে আল-আমীন মিশন সমাজকে উপহার দিয়েছে বহু কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। পড়াশোনায় সাফল্যের পর তাঁরা দেশে-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ পেশায় অথবা গবেষণায় ব্যস্ত। সেইসব প্রাক্তনীদের উপস্থিতি এই বিভাগে। এই সংখ্যায় অধ্যাপক

সুমন নীহার

আমার নাম সুমন

আসাদুল ইসলাম

কলকাতা থেকে লালগোলার দূরত্ব প্রায় ২৩০ কিমি। লালগোলা থানার দিয়ারফতেপুরের বালিপাড়া গ্রামে যেতে গেলে নামতে হয় পিরতলা হল্ট স্টেশনে। কলকাতা থেকে বালিপাড়া গ্রাম যেতে গেলে দূরত্ব খানিক কমে যায় লালগোলার চেয়ে, প্রায় ১০ কিমি। পিরতলা স্টেশন থেকে পূর্ব দিকে দেড়-দু কিমি গেলে পড়ে বালিপাড়া গ্রাম। ভাগীরথী নদীর পূর্ব দিকে, পদ্মা-হুগলির মধ্যবর্তী উপত্যকা অত্যন্ত উর্বর পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এই গাঙ্গেয় উপত্যকারই একটি গ্রাম বালিপাড়া। মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানার বালিপাড়া গ্রামটিকে ঘিরে আছে ফতেপুর, যশোইতলা, বালুটুঙ্গি, বেলিয়া শ্যামপুর গ্রামগুলো। আর আছে বালিপাড়া গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে যাওয়া ভৈরব নদী। যে-নদীটা আসলে মৃত। পলি জমে জমে মজে গিয়ে, জল শুকিয়ে গিয়ে পৃথিবীর বুকে হাজার হাজার নদী মৃত নদীতে পরিণত হয়েছে। ভৈরব তেমনই একটা নদী। বহরমপুর-লালগোলা সড়কপথ ধরে বা ভগবানগোলা থেকে রেলপথ ধরে লালগোলার পথ ধরে গেলে এই জানুয়ারির শেষের দিকে দেখতে পাবেন মাঠের জমি জুড়ে আছে নানা রকমের রবিশস্য। সরষে, গম, খেসারি কলাই, ছোলা আর নানা সবজি। গ্রামে ঢুকলে দেখবেন বেশিরভাগ মানুষের পাকাবাড়ি। একতলা বা দু-তলা। বাড়ি দেখে মনে হতে পারে, বালিপাড়া এলাকার মানুষের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ নয়। কিন্তু এই মনে হওয়া যে ভুল, তা ধরা পড়বে গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বললেই। আসল গল্প অন্য। আসল গল্প হল— গ্রামের বেশিরভাগ মানুষজন রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। গ্রামবাংলার বেশিরভাগ মানুষের প্রধান জীবিকা হল চাষবাস। কিন্তু বালিপাড়া গ্রামে চাষবাসের সঙ্গে টক্কর দেয় রাজমিস্ত্রির কাজ। মুসলমান অধ্যুষিত এই গ্রামে সাক্ষরতার হার ৭০ শতাংশের আশেপাশে। মাধ্যমিক দেওয়ার আগেই স্কুলছুট হয়ে ছেলেরা পাড়ি জমায় কলকাতা, চেন্নাই, ইন্দোর প্রভৃতি শহরে। বই-খাতা-পেন ছেড়ে সখ্য গড়ে ওঠে ইট বালি সিমেন্টের সঙ্গে। যে-এলাকার গড়পড়তা চিত্র এরকম, সেই এলাকার উজ্জ্বল এক ব্যতিক্রমী মানুষের আকাশ স্পর্শ করার গল্প শোনা যাক। কলকাতার মতো মহানগরীতে যখন তাঁরই গ্রামের কোনো যুবক ইটের পর ইট সাজাচ্ছেন, তখন সেই রাজমিস্ত্রির গ্রামতুতো দাদা বা ভাই শহরের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন— এই বিষয়টাকে কি আকাশ স্পর্শ করা বলা যায়? এসব প্রশ্নে মাথা না ঘামিয়ে চলুন, কীভাবে এমনটা সম্ভব হল জেনে নিই।

বালিপাড়া গ্রামের প্রয়াত আবু বাক্কার খুব কম পড়াশোনা জানতেন। চাষবাসই ছিল বেঁচে থাকার মাধ্যম। আবু বাক্কারের দুই পুত্র। ছেলেটির চাচা আল্লাম হোসেনের জীবিকাও চাষবাস। আর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া তাঁর পিতা মহম্মদ এহেসান আলি বিঘে দুয়েক জমিতে চাষ করা ছাড়া গ্রামেই ছোটো একটা জুতোর দোকান চালান। তাঁর মা নুরুননাহার বেগম মাধ্যমিক পাস করেছিলেন। বাড়ির কাছে আইড়মারী কৃষ্ণপুর গ্রামীণ হাসপাতালে জেনারেল ডিউটি অ্যাসিসট্যান্ট পদে চাকরি করতেন। মহম্মদ এহেসান আলি এবং নুরনাহার খাতুনের দুই সন্তান— সুমন নীহার ও রোক্কাইয়া খাতুন। প্রত্যন্ত গ্রামের অত্যন্ত সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান সুমন নীহার রাজ্যের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কীভাবে হলেন, সে গল্পই জানাব আপনাদের।

সুমন নীহারের জন্ম ১৯৮৭ সালের ২ মার্চ তারিখে। সুমনের মা

মহম্মদ এহেসান আলি এবং নুরনাহার খাতুনের দুই সন্তান— সুমন নীহার ও রোক্কাইয়া খাতুন। প্রত্যন্ত গ্রামের অত্যন্ত সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান সুমন নীহার রাজ্যের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কীভাবে হলেন, সে গল্পই জানাব আপনাদের।

আইড়মারী গ্রামে চাকরি করতেন, হাসপাতালের সংলগ্ন কোয়ার্টারে থাকতেন সপরিবারে। সেখানেই বেড়ে ওঠা সুমনের। বালিপাড়া গ্রাম থেকে আইড়মারীর দূরত্ব খুব বেশি নয়, কয়েকটা পাড়া পরেই। সুমনের মা ছিলেন একটু কড়া ধাতের ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা। নিজের ছেলেমেয়েদের মানুষ করার বিষয়ে তিনি ছিলেন আপোশহীন। তাই ছেলেমেয়েদের নিজের নজরদারিতে রাখতে এবং গ্রামের পড়াশোনা-বিমুখ পরিবেশ থেকে দূরে রাখতে কোয়ার্টারে রেখে আগলে রেখেছিলেন। সুমনের প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু ডি এফ ডি নার্সারি স্কুল নামে গ্রামের এক বেসরকারি স্কুলে। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ওই স্কুলে পড়ার পর পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন ধুলাউড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে। স্কুলটা সুমনদের বাড়ি থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে। সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করতেন। মা কড়া হওয়ায় একটা রুটিন মেনে চলতে হত। গ্রামের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বিকেলে খেলার সময়টুকু ছাড়া মেলামেশা করার সুযোগ ছিল না। স্কুল-টিউশনির বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পড়াশোনার পরিবেশে যতটা মেশা যায় ততটাই মিশতে পেতেন। গ্রামের ছেলেদের মধ্যে অল্প পড়াশোনা করে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে চলে যাওয়ার প্রবণতার কথা আগেই বলেছি। ফলে বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরা পড়াশোনাকে হালকাভাবে নিত। করতে হবে তাই পড়াশোনা করছে— এমন একটা পরিবেশ ছিল চারিদিকে। অসৎ সঙ্গে পড়ে এমন পরিবেশে ছেলেমেয়েদের ভুল পথে পা বাড়ানোর সম্ভাবনা সবসময় একটু বেশিই থাকে। নুরুননাহার তাই যতটা পারা যায় ছেলেমেয়েদের ওই পরিবেশ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতেন। গ্রামের যেসব পরিবার এই দিকে খেয়াল রাখতেন, হাতে গোনা হলেও সেসব পরিবার নিজেদের ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে পারতেন। সুমনের ক্লাসের যেসব বন্ধুরা তাঁর সঙ্গেই মেধা-তালিকায় প্রথম দিকে থাকতেন, পরবর্তী কালে সুমনের মতো তাঁরাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সুমন ধুলাউড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়েছিলেন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। ক্লাসে কখনো প্রথম কখনো দ্বিতীয় হতেন। বিজ্ঞান বিভাগ আর ইংরেজি— দুটো টিউশনি স্যারের কাছে পড়তেন। সকালে টিউশনি তারপর স্কুল, বিকেলে খেলাধুলো, সন্ধ্যায় পড়তে বসা— এই ছিল রুটিন। গ্রামের দিকে অতি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের যেমনটা হয়ে থাকে। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ায় ছেলের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন সুমনের মা। ছেলেকে বড়ো করার আশা ঘিরে তৈরি হয় আশঙ্কার মেঘ। তখন থেকেই তিনি ভাবতে শুরু করেন বিকল্প পথ নিয়ে। তাঁর কানে আসে আল-আমীন মিশনের কথা। ক্লাস এইটে পড়ার সময় নাইনে ভর্তি করার জন্য তিনি ফর্ম সংগ্রহ করেন। কাছাকাছি ভর্তির পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল ভগবানগোলা গার্লস হাই স্কুল। ভর্তির পরীক্ষা দিয়ে পাস করে প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সুমন বাবার হাত ধরে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলেন হাওড়া জেলার খলতপুরে, আল-আমীন মিশনে। ইন্টারভিউয়ে পাস করে ভর্তির সুযোগ পান। সুমন নীহার আল-আমীন মিশনে ভর্তির জন্য প্রাথমিকভাবে কোনো ছাড় পাননি। শর্ত ছিল পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারলে ছাড় দেওয়া হবে। পরে পরীক্ষায় ভালো ফল করে প্রায় অর্ধেক ছাড়ে পড়ার সুযোগ পান। মিশনে ভর্তি হলেন কিন্তু প্রথম প্রথম মানিয়ে নিতে খুব অসুবিধা হয়েছিল। দীর্ঘ দিন বাবা-মাকে ছেড়ে আগে কোনোদিন থাকেননি। ফলে প্রচণ্ড কান্নাকাটি চলেছিল কয়েক দিন। এমন ঘটনা এখনও ঘটে মিশনে, কিছু ছেলেমেয়ে এই কমন সমস্যার মুখে পড়েন। যাঁরা সেই সমস্যা কাটিয়ে থেকে যেতে পারেন তাঁদের সামনেই ধরা দেয় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। সুমন তাঁর আব্বা-মার কথা ভেবে, তাঁকে ঘিরে তাঁর আব্বা-মায়ের স্বপ্নের কথা ভেবে নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেন— পিছিয়ে গেলে হবে না। মিশনের স্যারদের উৎসাহ আর দাদাদের সাফল্যের কথা শুনে মনকে শান্ত করেন। সহপাঠী বন্ধুরা মন ভালো করে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মিশনে। সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় হলে বাড়ির প্রতি টান ফিকে হতে শুরু করে।

আল-আমীন মিশনে সুমন নীহার ছিলেন পাঁচ বছর। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতায় বসে কথা বলার সময় তিনি স্মৃতিচারণ করেন— "তখন মিশন তো আজকের মতো এত বড়ো ছিল না। তবে তখন যেটা ছিল আজও যেটা বজায় আছে— সেটা হল মিশনের পড়াশোনার পরিবেশ— তার জোরেই মিশন প্রতি বছর ভালো রেজাল্ট করে চলেছে ধারাবাহিকভাবে। মিশনের স্যাররা ছাত্রদের প্রতি খুবই যত্নশীল। আমাদের সময়কার ওয়ারেশ স্যার, হারুন স্যার, শতদল স্যার— প্রায় সব স্যারই আমাদের খুব ভালোবাসতেন। আর ছিল সহপাঠী বন্ধুদের পাশে থাকা। বাড়ির জন্য মন খারাপ হোক বা শরীর খারাপ, সবাই মিলে পাশে থেকে মন খারাপ ভুলিয়ে দিত। তবে বন্ধুদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও ছিল। ভালো ফল করার প্রতিযোগিতা। পরস্পরকে উদারহৃদয়ে সহযোগিতা করেও নিজে ভালো ফল কীভাবে করা যায়, তার আদর্শ উদাহরণ হতে পারে আল-আমীন মিশনের পড়ুয়ারা।" সেই সময়কার বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাওয়ায় তিনি জানালেন, "অনেক ঘটনা তো ঘটে মিশনে, তার মধ্যে তিনটে আজও মনে আছে। প্রথমটা হল হাম্মাদুরদার জয়েন্ট র‍্যাঙ্ক করা। হাম্মাদুরদা জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেডিকেল পরীক্ষায় রাজ্যে দশ র‍্যাঙ্ক করেছিল। হাম্মাদুরদার আগে বোধ হয় এত ভালো রেজাল্ট কেউ করেনি। আর দুটো ঘটনা অন্যরকম। প্রতি বছর মিশনে বিভিন্ন খ্যাতনামা মানুষজন আসতেন। এখনও আসেন। অন্য সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমনটা খুবই কম

র ক

ঘটে। বিখ্যাত মানুষদের চোখের সামনে দেখা, তাঁদের বক্তব্য ছাত্র-ছাত্রীদের খুবই অনুপ্রাণিত করে। আমাদের সময়ে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য এসেছিলেন একবার। আর-একবার বিখ্যাত কণ্ঠসংগীতশিল্পী কবীর সুমন ও তাঁর স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমীন এসেছিলেন। খুব হইহই হয়েছিল মিশন জুড়ে।" পাঁচ বছরের মিশনজীবনে এমন নানা স্মৃতি জমা হয়েছে সুমন নীহারের স্মৃতিকোঠায়। তিনি ২০০১ সালে ভর্তি হয়েছিলেন নবম শ্রেণিতে। ২০০৩ সালে মিশন থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিলেন ৭৮.২৫ শতাংশ নম্বর। ২০০৫ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পেয়েছিলেন ৬১.২৫ শতাংশ নম্বর। এত খারাপ ফল কেন? প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। গলার স্বর খাদে নেমে যায় আলাপচারিতার মাঝে। "জীবনের সবচেয়ে খারাপ ঘটনাটা ঘটেছিল ওই সময়।" কী হয়েছিল? "মায়ের ক্যান্সার ধরা পড়ল, পরীক্ষায় বসার কয়েক মাস আগে। এই রাজরোগ তো পুরো পরিবারকেই ধ্বংস করে দেয়। আমাদের পরিবারও খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে গেল। চিকিৎসার খরচা তো বিরাট ধাক্কা, তার সঙ্গে যদি জানা যায় চিকিৎসা করেও বিশেষ লাভ হবে না, তখন মানসিক বিপর্যয়ে চারিদিকে শুধু অন্ধকার নেমে আসে। যে-মানুষটা চলছে, ফিরছে, কথা বলছে, সে আর থাকবে না— এই ভয়ংকর ভাবনার অভিঘাত সবকিছু শেষ করে দিতে পারে। সেই মানুষটা যদি মা হন, এমন মা, যিনি পুরো পরিবারটাকে আগলে রাখেন, তাহলে বিপর্যয় আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। মায়ের ক্যান্সার ধরা পড়ার ধাক্কা সামাল দিতে পারিনি। সবসময় কান্না পেত, পড়াশোনায় মন বসাতে পারতাম না।" গলা ধরে আসে সুমনের। ধরা গলায় সুমন জানান, "মায়ের ক্যান্সার ধরা পড়ার পর বাড়ি ফিরে চলে আসব মিশন থেকে এমন পরিস্থিতি তৈরি হল। মা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, যেন মিশনেই পড়াশোনা করি। ছেলেমেয়েদের বড়ো করার স্বপ্ন লালন করে গেছেন মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। আজ আমরা দুই ভাই-বোনই সরকারি চাকরি করি, প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তা মা দেখে যেতে পারেননি।"

২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েই সহকারী অধ্যাপক হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশেরও অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে।

ক্যান্সারের মতো রোগের মোকাবিলা করা সহজ নয়। ক্যান্সারকে পরাজিত করা হোক বা ক্যান্সারের কাছে হেরে যাওয়া— যুদ্ধটা লড়তে হয় প্রাণ বাজি রেখে। শুধু রোগীকে নয়, লড়তে হয় পুরো পরিবারকে। সুমনের মায়ের ক্যান্সার হয়েছিল মাটীতে। প্রথমে ঘা হয়। স্থানীয় চিকিৎসক ধরতে পারেননি। ওষুধ খেয়ে না কমে ক্রমাগত বাড়তে থাকায় কলকাতায় এনে চিকিৎসা করে বায়োপসি করার পর ক্যান্সার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। তখন অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। টাটা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করার মতো অর্থ ছিল না। এইট পাস সুমন নীহারের আব্বা বিশেষ কিছু জানতেনও না। কলকাতাতে চিকিৎসা করাও কঠিন ছিল। কলকাতায় তেমন কোনো থাকার জায়গা ছিল না। সুমনের আব্বা তাঁর মায়ের মেডিকেলে চিকিৎসাকালে রাতে থাকতেন শিয়ালদহ স্টেশনে কিছু সহৃদয় গ্রুপ-ডি কর্মীর সঙ্গে। সকালে হেঁটে মেডিকেলে আসতেন, ওষুধপত্র কিনে দিয়ে, দেখাশোনা করে রাতে ফিরে যেতেন। অপারেশন করার পর ক্যান্সার দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রায় বছর খানেক চিকিৎসা করার পর ডাক্তার জানিয়ে দিয়েছিলেন আর-কোনো উপায় নেই। মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা শুধু। সুমনের মাও সেটা বুঝে গিয়েছিলেন। সুমনকে ডেকে বলেছিলেন, "আমি তো বাঁচব না, তোরা মানুষ হ।" সুমন যে মায়ের স্বপ্ন সফল করার পথে প্রথম পদক্ষেপটা সঠিকভাবে নিতে পেরেছেন, তা দেখে যেতে পারতেন, যদি তাঁর মা আর মাস দেড়েক বাঁচতেন। সুমন উচ্চ-মাধ্যমিক দেওয়ার বছরেই জয়েন্টে বসেছিলেন, কিন্তু র‍্যাঙ্ক করতে পারেননি। আরও এক বছর কোচিং নেন আল-আমীন মিশন থেকে। ২০০৬ সালে জয়েন্ট এন্ট্রান্স ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় তাঁর র‍্যাঙ্ক হল ১১৪৩। জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল বের হওয়ার আগেই মাকে হারালেন তিনি।

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পেলেন ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স টেকনোলজি, শিবপুর-এ। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া কালে আল-আমীন মিশনের মাধ্যমে জি ডি স্কলাপশিপ পেতেন। আর পেয়েছিলেন সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম প্রদত্ত মেরিট-কাম-মিনস স্কলারশিপ। সরকারি কলেজ হওয়ায় ফি কম ছিল তাই পড়াশোনা চালাতে অসুবিধা হয়নি। ২০১০ সালে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক হন। ওই বছরই গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট ফর ইঞ্জিনিয়ারিং বা গেট পরীক্ষা দিয়ে সর্বভারতীয় স্তরে র‍্যাঙ্ক হল ২২১৪। এম.টেক. করার জন্য ভর্তি হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০১২ সালে এম.টেক. পাস করলেন। ওই বছরই টেকনোম্যাক্স ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড নামক কোম্পানিতে সিনিয়র ইঞ্জিনিয়র পদে চাকরি পান। এক বছর পর জেআইএস গ্রুপের ড. সুধীরচন্দ্র সুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে যোগ দেন। ২০১৪ থেকে ২০১৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত— প্রায় দেড় বছর গনি খান চৌধুরী ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে সহকারী অধ্যাপক পদে চাকরি করেন। এরপর কলকাতায় ক্রিসেন্ট ইন্ডিয়া নামে একটি কোম্পানিতে যোগ দেন। চাকরি করা কালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচডি. শুরু করেন। এক বছর পর ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েই সহকারী অধ্যাপক হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্যের তো বটেই, দেশেরও অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে। মাধ্যমিকে বলার মতো নম্বর পেলেও উচ্চ-মাধ্যমিকে তাঁর প্রাপ্ত নম্বর অনেক সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর মতোই। তারপরও তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন একাগ্রতার সঙ্গে লেগে থাকার কৌশলকে কাজে লাগিয়ে। সুমনের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রথম দিকে মনে হচ্ছিল এ-বারের উজ্জ্বল প্রাক্তনীর গল্প সাদামাটা নিস্তরঙ্গ এক জীবনের গল্প। কিন্তু তাঁর মায়ের অকালপ্রয়াণের গল্প সেই ভাবনাকে আমূল নাড়িয়ে দেয়। বস্তুত মানুষের জীবনই এমন। কে কখন কোথায় কীভাবে গভীর খাদে পতিত হবে, কেউ জানে না। সেই গভীর খাদ থেকে উঠেও যে আবার শিখর স্পর্শ করা যায়, কারো কারো জীবন জানিয়ে যায় সে-কথা। আল-আমীন মিশনের প্রাক্তনী, মুর্শিদাবাদ জেলার বালিপাড়া নামক প্রত্যন্ত গ্রামের সন্তান সুমন নীহার তেমনই একজন। গভীর খাদ থেকে ওঠা শিখরস্পর্শ এক জীবন। ■

কথায় আছে, গাঁয়ে আর মায়ে সমান। হুই যে দূরে সবুজ রেখা, ওই দিকেই গেছে রেললাইন, রাজ্য সড়ক, পঞ্চায়েতের রাস্তা। কোথাও-বা আলপথ। সব পথই গেছে কোনো-না-কোনো গাঁয়ে। কেননা, বাংলায় গ্রামই এখনও সংখ্যায় অধিক। আর বঙ্গাদর্শনের ইচ্ছে হলে যেতে হবে ওইসব গ্রামদেশে।

প্রবাসের চিঠি, আত্মজাকে

সপ্তম কিস্তি

অশোককুমার কুণ্ডু

স্নেহের খিয়া,

"ওরে ও রিয়া, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? ও রিখি, ওঠ মা। ওরে ও রিখিয়া। দশ মিনিটও হয়নি! টিফিন করেছিস? ঘুমিয়ে পায়েস। বাব্বা, মা বাজার থেকে এসে ঘেঁটি ধরে তুলবে। মেয়ে ঘুম ছাড়া কিছু চায় না। খাবার না-দিলেও ঘুমটি পুরো চাই।"

যেই-না বললাম বেড়াতে নিয়ে যাব, অমনি লেপের ভিতর থেকে কুঁই-কুঁই পপি। চোখ মেলে শুধাল, "কোথায় নিয়ে যাবে? তোমার তো ওই গ্রামভ্রমণ। এথনিক! দূরে চলো-না। মা বলছিল, এ-বছর নাকি সাউথ ইন্ডিয়া প্যাক। এই শীতে নাকি, ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে সেই পুজো? পুজোর সময় আমার কলকাতা ছাড়তে ইচ্ছে করে না।"

তা না হয় হবে। আজ শনি। কাল রবি। রবিবার বিকেলে ফেরা। শনিবার দুপুরে চলো চন্দননগর।

ওহো। তুমি পার বটে! চন্দননগর একটা ট্যুর হল।

ওরে, সর্ট ট্যুর। বড়ো ট্যুরের আগে ট্রায়াল। প্রিফেস টু ...

তুমি যাও একা। অসম্ভব। আমার পোষাবে না।

লেপের গুহায় ঢুকে গেল মেয়ে।

ভাবি, মানুষ ভ্রমণে যায় কেন? টাকা ওড়াতে? নামি দেশের দামি স্পটে ভ্রমণ-ফেরত আভিজাত্যের বীজ রোপণ? প্রতিবেশীর কষ্টের জীবনের লাবণ্য শোধন ট্যুর বিবরণে? না বোধ করি। তবে কিছুটা, ট্যুর রূপে ন সংস্থিতা। তবে? বিনোদন! একই জীবনের ওপর আশা ঝলমল, চাপান সার। জীবনের দুঃখ-বিরহ ভ্রমণপথে রেখে আসা। মানুষ তো পক্ষীর জাত। বিবর্তনে তার ডানাদুটি বোধ করি হাতে রূপান্তরিত। বাম হাতে সে গ্লানি বিসর্জন দেয়। দক্ষিণ হস্তে সে আবার বপন করে আশার গেরস্থালি। ওই ভ্রমণপথ থেকে কুড়িয়ে আনে রুদ্রাক্ষ ও মৃত সঞ্জীবনী ফুল। বর্ধমানের গেলাপবাগে ফুটত এ-ফুল। শুকিয়ে গেলেও জলে দাও, আবার ফুটবে প্রথম দিনের শেষে।

চলো তবে, ত্বরা করি ভ্রমণে। কুড়িয়ে আনি মৃত সঞ্জীবনী পুষ্প। অমৃত পুষ্প। মৃত্যু পারাবার অমৃত। সেই আনন্দ-অমৃতজ্ঞানের সন্ধানে। 'প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাও।' এখানে চীন দেশের নাম উল্লেখ, দূরত্বের কারণে। বলছেন কে? আল্লার বিশ্বস্ত বান্দা পয়গম্বর (স.) ...

এই মর্মার্থ খুঁজে পেয়েছি, 'গুহার ভেতরে আলো, মুদ্রিত তথ্যে, জনাব মোস্তাক হোসেন লিখিত গ্রন্থের পৃষ্ঠায়, প্রকাশক আল-আমীন মিশন। এই কৃশ গ্রন্থটি আমার কাছে ইসলামি মর্মবাণীর ক্ষীর। বারে বারে আমি, মুদ্রিত বারোটি নির্দেশের দিকে তাকিয়ে থাকি। আপাত 'সংক্ষেপ'। ডুস অ্যান্ড ডোন্টস-এর স্বরলিপি। 'জ্ঞানার্জন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই বাধ্যতামূলক।' 'যে-ব্যক্তি জ্ঞানের সন্ধানে বের হন, আল্লাহ্ তাঁকে স্বর্গের পথ দেখান।'

কেয়া বাত, কেয়া বাত। ছোটো ছোটো সংক্ষেপিত বাক্যের সংঘবদ্ধতা যেন শরতের শিশির, ঘাসের ডগায় মুক্তাকাশ-দর্পণ। ভালোবাসি তাই পথ। বিশ্বাস করি পথ ও পথিক। সে পথ দেখায়। তাই তো চলেছি চন্দননগরের পথে। যেখানে গ্রাম-নগর যমজ ভাই। চলেছি, ভ্রমণ-আড্ডায়। বুড়ো পা-দুটি পথে হাঁটতে পারে না আজ। শরীর প্রতিবাদ করে। রুগ্‌ণ বিছানা যেন মায়ের কোল। শঙ্কায় সন্তানকে কাছ-ছাড়া করতে চায় না। কিন্তু ভ্রমণ ছাড়া বাঁচব কেমনে? ওই ভ্রমণ-আড্ডায় নবপ্রজন্মের ভ্রামণিক তরুণ-তরুণীরা পথের খবর আনে। ফোটো আনে। স্লাইড দেখায়। মুভি দেখায়। পথের শিরনি আনে। পাখান (পিরের দরগায় নিবেদিত বড়ো আকারের গুড়পিঠে) বিলোয়। তাই যাব। এইসব অভিজ্ঞতার বালুসাইয়ে ভাগ পেতে।

ভ্রমণ নামক সুকর্মটি অতীব প্রাচীন, সকল জনপদেই ছিল তা। পুরুলিয়া শহরে নেমে, লক্ষ্মীর কোলে বসে আছি। লক্ষ্মী হল সকালের বাস। নারায়ণ দুপুরের। বিকেলে দশদুর্গা। এই হল পথের প্রেসকিপশন। তিন দাগের মিক্সচার। সূর্য পশ্চিমে ঢললে আর নেই বাস। যান যান, পায়ে হেঁটে। লক্ষ্মীর সামনে, ড্রাইভারের বামে বিশালাকার হাঁড়ি, ডেকচি। পাশে বসা জনা চার। মাথায় টুপি, পরনে চেক লুঙ্গি। আমি সুগন্ধ পাচ্ছি ডেকচির। আমার মাথায় ভরে উঠছে জ্যান্ত খুশবাই। শুধাই, " চাচা, আস্‌সালাম-আলাইকুম। গেসলেন কোথায়?"

প্রত্যুত্তর, "ওয়াআলেকুম সালাম। আরে বাপ, দেশ ঘুরনে। আল্লার বাণী শোনাতে। বিলোতেও।"

তা এত বড়ো হাঁড়ি-ডেকচি-কড়া-খুন্তি কেন?

আমরা হলুম গিয়ে মুসাফির। গেরস্তির সংসারে ঢোকা মানা। সদরে, ইস্কুলে, পোড়ো ভিটেতে রাতে ঠাঁই। দরকারে বুজর্গ বট গাছের কোলে। কিন্তু হারগিস গেরস্তির সংসারে। এ-নিষেধ আমাদের ধর্মের। আবার কর্মেরও।

তা কেমন করে থাকেন চাচা? চব্বিশ ঘণ্টা সেখানে কী করেন?

প্রায় বছরের সিকি কাটে ঘুরে ঘুরে। এই চাষের আগে, ঘুরে ঘুরে ঘরে ফিরছি। গেরস্তের সদরে থাকি। নিজেদের খানা নিজেরাই পাকাই, ডেইলি। পাঁচোক্ত নামাজ। গেরস্তকে আল্লার বাণী-বচন শোনানো হয়। হাঁড়ির ভিতরে ছোট্ট হাঁড়িতে মোদের রান্না। বড়ো ডেকচিতে একদিনই মাত্র রান্না, চলে আসার আগে গাঁয়ের সকলের।

বা, বাহ্। তোফা কাম। এই সদাচার, তা কতক্ষণ এই কাম?

এর তো টাইম নাই সোনাবাপ। যতক্ষণ নিশ্বাস ততক্ষণই খোদার কথা শোনাতে হয়। শুনতেও হয়। ফজর থেকে এশা পর্যন্ত। ফজরের আজানে পাখি জাগে। এশায় জাগে রাত দু-পহর পর্যন্ত, আশমানের তারার সঙ্গে মুয়াজ্জিন। বুঝলে কিনা? আমরা এই কাজে দেশে দেশে, পল্লি-গেরামে ঘুরে বেড়াই। আমাদের নিজ গেরাম হদ্‌লা, আমার পাশের জনা জামুয়ার বাসিন্দা।

বলতে আর হবে না। বাবু সব জানে। শহরের লোক হলে কী হয়। উনি গাঁ-ঘুরুনি। ওনার বন্ধু তো সুবাস (সুভাষ) মাস্টার। চেলিয়ামায় ঘর। বাবু যাচ্চেন ওনার বন্ধু, মাস্টারের বাড়ি চেলিয়ামায়। হোতায় হবে তিন দিন পলাশ-পরব। কি সোনাবাবা, ঠিক বলেচি তো?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, একদম ঠিক। গেলবারেই তো কত কথা হল তোমাদের সঙ্গে। আমায় নেমনতন্ন করলে তোমরা তোমাদের গাঁয়ে যেতে। আমি গেনু তো জামুয়াতে।

ওদের আপত্তি উড়িয়ে আমি ওদের টিকিট কাটলাম। বললাম, ফকির মানুষ তোমরা। খোদার বার্তা নিয়ে তোমরা গৃহীর দুয়ারে পৌঁছে গিয়ে, শান্তি দাও পোড়া মানুষকে। তোমাদের কর্ম কত বড়ো! দূরভ্রমণে তোমরা কত কত গল্প কুড়িয়ে এনে দাও আর-এক গাঁয়ের মানুষের কাছে। তোমরাই তো সেরা ভ্রামণিক। তোমরাই তো অপুরস্কৃত সেরা, শ্রদ্ধেয় মুসাফির। তোমাদের পুণ্যের পরশ পেতে চাই। কনডাক্টর ভাই, চারটে জামুয়া, দুটো হদ্‌লা আর আমার একটা চেলিয়ামা।

বিশুদ্ধ ভ্রামণিকরা, এনারা হলেন মারাংবুরু, ঈশ্বর, খোদা। তীর্থঙ্করের বার্তা নিয়ে ভাঙা পথের রাঙা ধুলোয় রেখে যেত, পুণ্য পথের ওপর, পূর্ণ পদযুগলের ছাপ। ভুলে গেলে তুমি অশোকব্রত, স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থে হিউয়েন

সাঙের হেঁটে চলার লাইন ড্রয়িং? মুখমণ্ডলে তাঁর উদার আকাশ ভাসত। হৃদয়ে ভালোবাসার মৃগনাভির সুবাস। সভ্যতার সেরা প্রাণের স্পন্দন তাঁর বক্ষে।

ভুলে গেলে চলবে কী করে! গৌরিক বস্ত্রে রঞ্জিত করে গুরু শিষ্যকে ঠেলে দিত পথের পরে। দশ-বারো বছর নানা জনপদে ঘুরে, মাধুকরী করে, গায়ে-পায়ে ধুলো মেখে ফিরত দীক্ষাশ্রমে, গুরুর কুঠিয়ায়। গুরুও তো ধ্যানাসন থেকে পথের দিকে তাকিয়ে, বসে বসে অপেক্ষা করত দীক্ষা-সন্তানের। আশ্রমের সব কাজ করতে করতে গুরুর মন পড়ে থাকত শিষ্যের পদধ্বনির অপেক্ষায়। এই জন্যেই তো বলে, 'রমতা সাধু আউর বহতা পানি'। লোকভ্রামণিকদের কথা কি মসী দিয়ে গভীর রেখাঙ্কৃত করেছেন? আমার তো নজরে পড়েনি। তবে কি, আমার চোখের নজর কম হল? কী হবে আর কাজল দিয়ে?

কতবার যে ভেবেছি, এই হদ্‌লা, জামুয়ার মুসাফিরদের সঙ্গে একবার পথে নামি। জীবনের অনেক বছর তো বরবাদ হয়েছে। বরং আমি এই ভারতের রেজ্জাকচাচা, গোলাম কিবরিয়াদের দলে ভিড়ে জীবনের তিন-চার-পাঁচ মাস রাঙা পথে মিশিয়ে দিই। হল না, হল না আম্মা। হল না কন্যা, রিখি।

জোহরের ওয়াক্তের পরে সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত, ছায়া দীর্ঘ হয়। হয় পশ্চিমগামী। বেলা ছোটো হয়ে আসে। পথ ডাকে। পা বাড়াই। ঝুপ করে সূর্য ডুবে যায়। আঁধারে ঢাকে পথ। ভ্রমণে যাওয়া হয় না আম্মা। 'জীবন যে রে স্বপ্ন মায়া/ ওরে কাঙাল মন।' (ঢুলি, বাংলা চলচ্চিত্র,১৯৫৪, লিরিক: বিমল ঘোষ। কাহিনি: বিধায়ক ভট্টাচার্য। সংগীত: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।)।

ভ্রমণ, এখন বিভ্রমণ। করপোরেট শাসিত ও নিষিক্ত। যাওয়া-আসার কনফার্মড টিকেট। গরম জল। সাদা টাওয়েল। ফ্লোটেল-হোটেলের আমোদ। নির্জনে হোম স্টে। ফেরার সময় প্রকৃতির এক-একটা চুড়োতে সভ্যতার আবর্জনা। পাহাড়শৃঙ্গজয়! কী নির্বোধ অহং, আরও নির্মম অহং টাকা দিলে পাহাড়ের মাথায়, হিংস্র জয়! হায় ক্লাইম্বিং সভ্যতা! কোথাও নেই ডিসকভার অথবা ইনভেনশনের রোমাঞ্চ। নেই বিস্ময়-আনন্দ-অশ্রু। আছে শুধু বিজ্ঞাপিত, করপোরেট প্রপঞ্চ মায়া-বিভ্রম এবং ফেরার পরে প্রতিবেশীদের সিক্ত নয়নে সজল মেঘের বিস্তার। হায় রে ভ্রমণ! হায় রে বিভ্রমণ।

চন্দননগর। গণকণ্ঠে চন্নগর। দশ বাঁও দূরে গঙ্গা। রবীন্দ্রভবন থেকে ঝাঁপ দিয়ে সমাপ্তি-দুঃখের পরশ পেতে পার। রবীন্দ্রভবনটিও বাইরে-ভিতরে সুন্দর। মঞ্চে এখন আর্ক ল্যাম্প, চওড়া হাসিতে। কোলাহল নেই। মঞ্চে উঠতে উঠতে কাঁপন ধরেছিল পায়ে। সংকোচের বিহ্বলতায় চোখ মুখ ভাসছে। তথাপি ভাসিয়ে দিলেন নগর চন্দননগরকে। উনি বেচিবালা। উনি প্রান্তবাসিনী সম্রাজ্ঞী মুড়িমাসি।

"মুড়িমাসি মুড়িমাসি/ কোনখানেতে থাকো/ ফোলা মুড়ি থাকলে পরে/ আমাদের ঘরে এসো।"

"থাকি আমি সিঙুরের ঘনশ্যামপুর গাঁয়ে/ বেচি মুড়ি যাই শ্রীরামপুর পানে/ তাই তো আমি বেচিবালা/ খেতে ভালো ভাজা চাল/ আর দেখতে ভালো মুড়ি/ নেবে তো নাও/ নইলে পরে চলি।"

কখনো মঞ্চ দেখেননি এবং সেখানে বসেননি বেচিবালা দাসী। ষাট পার এই শীতে। এ-আসরে তিনিই অপুরস্কৃত, সেরা ভ্রামণিক। শ্রীরামপুর শহর থেকে দশ-বারো কিলোমিটার দূরে ঘনশ্যামপুরে গাছের ছায়ার ঘোমটা, আকাশের আলোর নীচে বেচিবালার দুই পুত্র বউমা ও নাতি-নাতনির সংসার।

"তা বাবা এত বড়ো ঘর এত আলো এমন অনেক মানুষ তো দেখিনি। আমার উনুনশালে দামাল সাদা মুড়ি ছোটে, ঘোরে। সাদামাটা জীবন। কী আর বলব তোমাদের। ওই যে ঘর ঘর মুড়ি বেচি, তেনারা বছরে একবার বেড়াতে যায়। আমায় বলে চলো, তুমিও চলো। আমি গরিব মানুষ। পয়সা কোথা পাব। বাবুরা বললে, পয়সা লাগবে না তোমার। তুমি আমাদের জন্যে রাঁধবে। আর আমাদের বাচ্চাদের গপ্পো বলবে। সেই হল শুরু।

"কত কত দেশ দেখনু। সে কী জল আর জল! আকাশ ঝুলে পড়েছে দূরে (কো-ভালাম)। সবেতেই টক খায় সে-দেশে। অত পাকা তেঁতুল কোথায় পায় কে জানে! ইকড়ুমিকড়ু কথা আর বুঝি না। আর-একটা দেশ। সেখেনে দুটো নদী। একটায় বন্যা, বানের মতন ঘোলা জল। আর-একটা নীল। ওপর দিয়ে নৌকার হালের ধাক্কা। ঘোলা জল আর নীল জল মিশছে না। কী আশ্চার্য বাবা। দেশটার নামটা আর মনে নাই (ইলাহাবাদ, সংগম)। ওই দেশেই ইন্দিরার বাপের ঘর। বলব কী, সব ঘরেই পৌষ-মাঘের শীত (এয়ার কন্ডিসন)। জাড়ে মরি বাবু। ইন্দিরাকে মেরে দিলে। আমি বলি, মারার কী দরকার রে বাপু। এত বড়ো দেশ। সবাই থাক-না রে বাপু। ইন্দিরার বাপের ঘর বেশ বড়ো, চক মেলানো। তবে মথুরা-বৃন্দাবন গেলে ঘরে আর মন ফেরে না।"

'ভ্রমণ-আড্ডা', ভদ্রেশ্বরের। একগুচ্ছ ঊর্দ্ধমুখী দেবদারুর গাঢ় সবুজের শক্তিতে, ভ্রমণের পরিসরে বিপ্লব ঘটিয়েছে। ভ্রমণ বিবরণের জন্য 'কলম

চন্দনগর। গণকণ্ঠে চন্নগর। দশ বাঁও দূরে গঙ্গা। রবোন্দ্রভবন থেকে ঝাঁপ দিয়ে সমাপ্তি-দুঃখের পরশ পেরে পার। রবীন্দ্রভবনটিও বাইরে-ভিতরে সুন্দর। মঞ্চে এখন আর্ক ল্যাম্প, চওড়া হাসিতে। কোলাহল নেই। মঞ্চে উঠতে উঠতে কাঁপন ধরেছিল পায়ে।

সম্মান', শ্রেষ্ঠ ভ্রামণিককে 'মুসাফির সম্মান', পায়ে হেঁটে স্বদেশপরিচয় খোঁজার জন্য 'ভ্রমণ সম্মান' দেয়। খুঁজে খুঁজে উন্মাদ বের করেন এইসব ভদ্র পাগলেরা। গোটাটাই উন্মাদের পাণ্ডুলিপি, আলোয় আনেন এঁরা। পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত জৈন সংস্কৃতির স্থাপত্য সন্ধানে তিন দশক পায়ে হেঁটে, সাইকেলে ভ্রামণিক সুভাষ রায়কে ভ্রমণ সম্মান দিলেন এঁরা। কম খরচে (ইয়ুথ হস্টেল, মঠদলিজে, মন্দিরে আশ্রয়। মানুষের সংসারে কাটানো। এক জোড়া মুসাফির অজিত হালদার সস্ত্রীক। ৮২ বছরে হালদারবাবু আজও হাল ধরে আছেন ভ্রমণের। ১৩০-টি দেশ ঘোরা। ৬ খণ্ডে ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত। বাকি দুটি খণ্ড, ঘড়াং ঘড়াং— মেশিনে। মুসাফির সম্মান এই বিশ্বপরিব্রাজককে।

চমকে গিয়েছিলাম। এমন ডাকাবুকো গেছো কন্যা রেশমী পালকে দেখে। রেশমী পাল মাস্টারনি। স্বামী সৈকত পায়ে সোনার শিকল পরবেন না বলেই, ডাক্তারি প্র্যাকটিস না করে, ডাক্তার তৈরি করেন। ডাক্তারি পড়ুয়াদের ক্লাস নেন। অধ্যাপক হয়ে ছুটিছাটা মেলে একটু বেশি, তাই দিয়ে সংবচ্ছরের ভ্রমণপথের 'জলপানি'। বই এবং পথ এঁদের দু-জনেরই সমান প্রিয়। দু-জনে পৃথিবীর নানা পথে, দোঁহে মিলে ভ্রমণ ও স্বরলিপি লেখেন। ওঁরা দু-জনে সদ্য ঘুরে এসেছেন হায়নার গায়ে হাত বুলিয়ে, হায়নাদের মুখে মাংস দিয়ে। জ্যান্তই ফিরে এসে গল্প লিখেছেন। দেখলাম, এতটুকু মেয়ে ভ্রমণ সাংবাদিকতার নতুন ভাষা, এইটথ জেনারেশনের ইডিয়ম খুঁজে পেয়েছে। ধন্য তুমি রেশমী, ওগো ডাকাতিয়া কন্যা, ও তোমার পালকির গানের সমুদ্রসৈকত।

ভ্রমণ-আড্ডার পেরিয়েছে, পার হয়ে গেছে, আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের দিনযাপনের গ্লানিমা। মুছেছে সংসার বিরহের সুখ-দুঃখ। যাই, দুপুরের খাবার ঘণ্টা বাজল। বুড়োবুড়ি থুড়ি সিনিয়র সিটিজেন, যুবক-যুবতী, কুচো-কাঁচা। সফেদ সাদা কুন্দ ফুলের চুড়োয় গরম ধোঁয়া-ওঠা ফুলকপি ও আলু মেশাচ্ছে হক্কলে। আলুচখা আর চাটনি থেকে টমাটো উঠে এসে শুধাল, বাবুরা-বিবিরা ভালো আছ তো? সুখে থেকো। নয়নে নয়ন রেখো। কল্পনা-জবা-সুলেখা-রত্নারা দু-ছেলের মায়েরা আজ দু-বেণীর কিশোরী। বইয়ের স্টল দিয়েছে। সব বই ভ্রমণপথের। ভ্রমণকে বিষয় করে ভ্রমণ। বিভ্রমণ নহে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 'ভুখা মানুষ ধরো বই, ওটা তোমার হাতিয়ার'— ইজজিন ব্রেটল্ট ফেডরিক ব্রেখট, ১৮৯৮-১৯৫৬। এমন ভ্রমণ-আড্ডার ভাস্কর, ভাস্বর এঁরা, এইসব গৃহী-সংসারী-ভবঘুরে মুসাফিরেরা।

হাপুস-হুপুস শব্দে, চাটনি চমকানের শব্দে, বক উড়ে পালাল গঙ্গার ওপারে। দেশ-বিদেশের পাহাড়-পথ-অরণ্যানী থেকে পথের গল্প সেলুলয়েডে ফোকাস করা হল মঞ্চোপরি। অপূর্ব সব দেশ, মানুষ, তাদের শোকানন্দ সংসারের কাহিনি। মন-মাতানো মহিমা, কাহিনির হীরকদ্যুতি। এগুলো দেখলি না তুই রিখিয়া। ঘুমে, নিদ্রামগনে, লেপের গুহায় রিয়া, এই পৌষের জাড়ে তুই। দেখো দেখো, আশমানের ধ্রুবতারা, অপূর্ব বণিকের কিরগিজস্তান, সাবেক সোভিয়েতের অঙ্গারাজ্য স্বাধীন, তারই মুক্তাকাশের ছবি। কুণালের ফিল্ম ভারত বনাম চীন। জয়দীপের অন্বেষণ ভারত-আত্মা, এই সময়ে দুর্যোগের পথে, ভারতের নানা জনপদে ছলাৎ ছল, সম্প্রীতির রোশনাই। গ্রামজনপদের সারসত্য এখনও কলঙ্কহীন বহতা, বাজে দিলরুবা। এরা সব পাগল পথিক, চলেছে জীবনের অন্বেষণে।

পথের কোনো জাত নেই গো। সে জীবন হইতে জাত। বাংলাদেশ থেকে আগত মেহমান আসফারুজ্জামান উজ্জ্বল থাকবেন আমাদের দিলের দিলে। অম্বিকা কালনার শিল্পী বাংলার বারো হাত মসলিন শাড়ি নিয়ে, সুকুমার দাস আংটির ভিতর দিয়ে ল্যাজা-মুড়ো। ওরে খিয়া, তোরা তো ফেডেড সময়ের নীলে, ট্যাটার্ড টাউজারে, শাড়িকে পাঠালি কাশী মিত্তিরের ইলেকট্রিক চুল্লিতে। তবে আমিই কিনি ওই হাতছানি মরুদ্যান মসলিন। সামান্য শাড়ি, দামও যৎসামান্য, বাইশ হাজার থেকে শুরু। কিনে কাকেই দেব এই অবেলায়।

প্লিজ গিভ এ বিগ হ্যান্ড ফর ড. সেখ মকবুল ইসলাম, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের আধ্যাপক, সাকিন হাওড়া। সমগ্র জীবন জুড়ে খুঁজে বেড়িয়েছেন জগন্নাথের অবস্থান, শুধু পুরীতে বা শিলঙেই নয়। সমগ্র ভারতে। এত বড়ো 'ব্রাহ্মণ'কে ভারতীয় সালাম। গোটা মঞ্চ জুড়ে এখন উড়ছে আমেদাবাদের ঘুড়ি। পেটকাটি চাঁদিয়াল, মাটিতে অবজ্ঞা।

লম্বু এক, চন্নগরের বাসিন্দার 'মধুরেন সমাপয়েত'। ও আর-এক পাগলা। যৌবন বাউল রজতচক্র, পাপী ভরমন সবুজ কা সওয়াল শুরু করেছে, 'হেরিটেজ হাঁটাহাঁটি'— সঙ্গে গরবিনি সৃজিতা। চন্দননগরের চলন্ত ইতিহাস পাঁচটা দলে ২৫০ জনা হাটুরে হাঁটছে। হাঁটছে ফরাসি চন্দননগর। হাঁটছে দিনেমার। হাঁটছে গর্বিত ইংরেজ।

"বাবা। বাবু। আব্বা। আবু সিব্বাল, গাঁ-প্রেমিক।"

চমকে উঠে পিছন পানে। সোনার বাংলার হিরের মেয়ে রিখিয়া, রিয়া, খিয়া হাসিমুখে হাত নাড়ে গঙ্গায় ভাসন্ত স্টিমার থেকে। বিপরীত স্রোতে ভাসিয়েছে সে ভেলা, নিরুদ্দেশের জলপথে। সাবাস বেটি। ■

বিচিত্র এই বিশ্বে কত তথ্য আর তত্ত্ব, তার সীমা নেই শেষ নেই কোনো। এই বৈচিত্র্যের কারণে জগৎ অপার আনন্দময় ও বিস্ময়ের। এসবের কোনোটা সংবাদশিরোনামে আসে, কোনোটা আসে না। এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ টুকরো খবর নিয়ে এই পাতা। লিখছেন

ফরিদা নাসরিন

পরিসংখ্যান

ধরা যাক, ইংরেজি গ্রামার বইয়ের তিনটে অধ্যায় ক্লাসে পড়ানো হয়েছে। মোট ১৫ পৃষ্ঠা। মাস্টারমশাই জানতে চাইলেন, আমরা বাড়িতে কে কতটা পড়েছি। জানা গেল— আমি এ পর্যন্ত পড়েছি ৭ পৃষ্ঠা। ক্লাসের কেউ পড়েছে ৯ পৃষ্ঠা, কেউ ৬ পৃষ্ঠা, কেউ ৮ পৃষ্ঠা। ক্লাসের থেকে আমরা কে কতটা পিছিয়ে আছি, এটা জানা গেল। সার্বিকভাবে পড়ুয়ারা কতটা পিছিয়ে আছে, কী করে জানব? যদি মোট পড়ুয়া হয় ৩০ জন, তাহলে কে কত পৃষ্ঠা পড়েছে, সবটা যোগ করে যোগফলকে ৩০ দিয়ে ভাগ করলে একটা গড় হিসেব আমরা পেতে পারি। হয়তো উত্তর এল ৬.৯। এটিই আমাদের ক্লাসের পড়ুয়াদের ইংরেজি গ্রামার পড়ার অগ্রগতি। আর, কোনো বিষয় সামগ্রিকভাবে জানার জন্যে এই পদ্ধতি, একেই বলে পরিসংখ্যান, ইংরেজিতে Statistics।

পরিসংখ্যান গণিতশাস্ত্রের একটি ফলিত শাখা। এক বা একাধিক ঘটনা বা বিষয়ের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের লক্ষ্যে সংগৃহীত উপাত্তের গাণিতিক শ্রেণিবিন্যাসকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ব্যাখ্যা প্রদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। লাতিন শব্দ status অথবা ইতালীয় শব্দ statista কিংবা জার্মান statistik শব্দ থেকে পরিসংখ্যান শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ statistics-এর উৎপত্তি, যাদের প্রতিটির অর্থ রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা। জার্মান অধ্যাপক Gottfried Ackenwall (১৭১৯-১৭৭২) সর্বপ্রথম পরিসংখ্যানকে 'রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রনীতি' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ১৭৭০ সালে Baron J F Von Bieldfeld-এর লেখা এবং W Hooper MD কর্তৃক অনূদিত 'Elements of Universal Erudition' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে (৩য় খণ্ড, ১৭৭০) পরিসংখ্যানের অন্য একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে— "পরিসংখ্যান হচ্ছে সেই বিজ্ঞান, যা পৃথিবীর সকল আধুনিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সজ্জাবিন্যাস শিক্ষা দেয়।"

আধুনিক পরিসংখ্যানবিজ্ঞানের জনক স্যার রোনাল্ড এলমার ফিশার (১৮৯০-১৯৬২) একজন ব্রিটিশ পরিসংখ্যানবিদ এবং প্রজননবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ছিলেন। পরিসংখ্যানবিজ্ঞানে অবদানের জন্য তাঁকে বিংশ শতাব্দীর পরিসংখ্যানবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বলা হয়। তিনি এমন একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি, যিনি প্রায় একাই আধুনিক পরিসংখ্যানবিজ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করেন। প্রজননশাস্ত্রে, তিনি গণিত ব্যবহার করে মেন্ডেলিয়ান জেনেটিক্স এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনকে একত্রিত করেছিলেন, এটি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ডারউইনবাদের পুনরুজ্জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল, যা বর্তমানে 'আধুনিক সংশ্লেষণ' হিসেবে পরিচিত। জীবনবিজ্ঞানে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলোর জন্য তাঁকে ডারউইনের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী বলা হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশের অংশ হিসেবে বাংলা নামক ভূখণ্ডে পরিসংখ্যানশাস্ত্রচর্চার ইতিহাস অনেক পুরোনো। দু-হাজার বছরেরও আগে, বিশেষ করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪-৩০০) শাসনকালে এ-অঞ্চলে সরকারি ও প্রশাসনিক কাজকর্মের প্রয়োজনে পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহের একটি দক্ষতাপূর্ণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায়, বাংলায় খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দেও জৈব পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহ এবং জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মুঘল আমলেও বাংলায় পরিসংখ্যান উপাত্ত সংগ্রহ করা হত এবং তা প্রশাসনিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা হত। মুঘল আমলের পরিসংখ্যানগত তথ্যের দুটি প্রধান দলিল হচ্ছে 'তুজক-ই-বাবরি'

এবং 'আইন-ই-আকবরি'। সম্রাট আকবরের শাসনকালে (১৫৫৬-১৬০৫) তাঁর ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী রাজা টোডরমাল সাম্রাজ্যের ভূমি ও কৃষি পরিসংখ্যান সম্পর্কিত তথ্যাদি অত্যন্ত চমৎকারভাবে সংরক্ষণ ও নথিভুক্ত করতেন। ১৫৯৬ সালে আবুল ফজলের লেখা 'আইন-ই-আকবরি'কে সম্রাট আকবরের আমলের সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাবলি সম্পর্কিত তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ব্রিটিশদের ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে এতদঞ্চলে মুঘল শাসনের অবসান ঘটে। শুরু হয় ইংরেজদের শাসনামল। অষ্টাদশ শতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভূমি-রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে রায়ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত এই পদ্ধতি বহাল থাকে। ১৮৬৩ সালে কোম্পানির কর্মকর্তা স্যার উইলিয়ম উইলসন হান্টার বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের একটি রীতিবদ্ধ গেজেটিয়ার প্রণয়নের কর্মপরিকল্পনা সরকারের কাছে উপস্থাপন করেন। ১৮৬৭ সাল থেকে এই গেজেটিয়ারের জন্য ছয়টি শিরোনামে গঠিত পরিসংখ্যান নির্দেশনাপত্রের মাধ্যমে প্রদেশদুটির ৫৯-টি জেলার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়। শিরোনামগুলো ছিল ভূ-প্রকৃতি, জনসংখ্যাগত বর্ণনা, কৃষি, শিল্প, প্রশাসনিক বর্ণনা এবং চিকিৎসা। ১৮৭১ সালে হান্টার কৃষি, রাজস্ব ও বাণিজ্য অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান বিভাগের মহাপরিচালক নিযুক্ত হন। বঙ্গ প্রদেশের গেজেটিয়ার 'A Statistical Account of Bengal' প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালে এবং ১৮৮১ সালে 'ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

তখন থেকেই বেশ কিছু সরকারি বিভাগ এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাদের নিজ নিজ দপ্তরের পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রকাশ করতে আরম্ভ করে। ১৮৮০ সালে অর্থ দপ্তর এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর, ১৮৭৪ থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত যথাক্রমে তাদের অর্থ ও রাজস্ব বিবরণ এবং বিচার ও প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহের কর্মকাণ্ডের তথ্য সংবলিত 'Statistics of British India' প্রকাশ করে।

১৮৮১ সালে বঙ্গীয় প্রদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম আদমশুমারি পরিচালিত হয়। তখন থেকেই প্রতি দশ বছর অন্তর এই

অঞ্চলে আদমশুমারি অনুষ্ঠান একটি সাধারণ রীতি হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্নমুখী তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও সম্পাদনার উদ্দেশ্যে ১৮৯৫ সালে একটি পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়, যার প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয় কলকাতায়। একই বছর পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি করা হয় এবং ১৯০৬ সালে এই পদের পুনর্বিন্যাস করে নামকরণ করা হয় বাণিজ্যিক গোয়েন্দা বিভাগের মহাপরিচালক। এই বিভাগের দায়িত্ব ছিল কৃষি, বৈদেশিক, উপকূলীয় ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, পণ্যমূল্য প্রভৃতি সংক্রান্ত পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহ, সম্পাদনা ও প্রকাশ করা। ১৯১০ সালে মেসার্স দত্ত, শিরাস ও গুপ্ত সমন্বয়ে গঠিত দল পণ্যসামগ্রীর মূল্য সংক্রান্ত একটি জরিপকার্য পরিচালনা করে এবং ১৯১৩ সালে তারা একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত এই পরিসংখ্যান সারণিগুলো ছিল পরিসংখ্যানশাস্ত্রের ইতিহাস এবং ঔপনিবেশিক ভারতের প্রাথমিক অগ্রগতিতে মূল্যবান অবদানস্বরূপ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে পরিসংখ্যান স্বীকৃতি লাভ করে। তবে বঙ্গীয় প্রদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে এই শাস্ত্রের বিকাশ ছিল অত্যন্ত ধীর। ১৯৩০ সালের প্রথম দিকে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি এন ব্যানার্জি এবং অধ্যাপক এন আর সেনের সহযোগে পরিসংখ্যান বিষয়ে উচ্চতর অধ্যয়নের লক্ষ্যে একটি অ্যাসোসিয়েশন গড়ার প্রস্তাব নিয়ে একটি সভা আহ্বান করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক আর এন মুখার্জিকে সভাপতি এবং অধ্যাপক মহলানবীশকে সম্মাননীয় সাধারণ সম্পাদক করে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একটি বেসরকারি ও অলাভজনক জ্ঞান বিতরণকারী সোসাইটি হিসেবে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট ১৯৩১ সালের ২৮ এপ্রিল তারিখে সরকারের নিবন্ধন পরিদপ্তরে নিবন্ধিত হয়। ১৯৩১ সালে কলকাতায় ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট (আই.এস.আই.) প্রতিষ্ঠা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে পরিসংখ্যানশাস্ত্রের বিকাশ ও উন্নয়নের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

এই ইনস্টিটিউট পরিসংখ্যান গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা এবং অধিকতর সুসংগঠিত উপায়ে বৃহৎ নমুনা জরিপ পরিচালনার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। ইনস্টিটিউট ১৯৩৩ সাল থেকে 'সংখ্যা' নামে একটি জার্নাল প্রকাশ শুরু করে। এ-সময় অধ্যাপক মহলানবীশ দেশের উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিসংখ্যান বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ কোর্স চালু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগ খুলতে রাজি করান।

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট শুরু থেকেই অধ্যাপক

মহলানবীশের যোগ্য পরিচালনায় ভারত সরকারের অধীনে একটি নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ইনস্টিটিউটের কর্মকাণ্ডের পরিধি পরিসংখ্যানগত জ্ঞানের বিস্তার, গবেষণা, পরিসংখ্যানিক তত্ত্বসমূহের উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসকল তত্ত্বের প্রয়োগপদ্ধতি নির্ণয়, জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনয়ন এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করে। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল এতদঞ্চলে পরিসংখ্যানশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের সুবিধা-প্রদানকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কর্তৃক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট (আই.এস.আই.) অ্যাক্ট অব ১৯৫৯ অনুমোদনের মধ্য দিয়ে আই.এস.আই. একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সেই সঙ্গে ইনস্টিটিউট পরিসংখ্যানশাস্ত্রে ডিপ্লোমা ও উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতা লাভ করে। এর পর থেকেই আই.এস.আই. ভারতে পরিসংখ্যান তত্ত্বের উন্নয়ন ও চর্চায় একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে থাকে। এই ইনস্টিটিউটের মৌলিক অবদানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— নমুনা জরিপ, বহুচলক বিশ্লেষণ (multivariate analysis), পরীক্ষণ পরিকল্পনা (design of experiments) এবং অনুমিতির প্রচুরক (modes of inferences) ইত্যাদি বিষয়ের উন্নয়ন সাধন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে ক্ষুদ্র এলাকা পরিসংখ্যান, পরিবেশগত পরিসংখ্যান এবং বায়েজিয়ান বিশ্লেষণ (Bayesian analysis)। ভারতের ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশন (এন.এস.এস.ও.) প্রতিষ্ঠায় এই ইনস্টিটিউটের ভূমিকা অগ্রগণ্য। ১৯৪৮ সালে পরিসংখ্যানগত গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ (Statistical Quality Control) আন্দোলনের জনক ডব্লিউ এ শিউহার্ট (W A Shewhart)-এর ভারত সফরের মধ্য দিয়ে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটও ভারতে এই আন্দোলন শুরু করে। পরিসংখ্যানগত গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ ভারতের সকল গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্রে সম্প্রসারিত হয় এবং এ-লক্ষ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ফলিত সেবা ও পরামর্শ বিষয়ে নিবিড় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

অধ্যাপক পি সি মহলানবীশের আগ্রহ ও উদ্যোগের ফলে ভারত, বিশেষত বৃহত্তর বঙ্গে পরিসংখ্যানশাস্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং এর বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটতে থাকে। সাম্রাজ্যের প্রয়োজন থেকে শুরু করে জাতীয় প্রয়োজন পূরণে পরিসংখ্যানশাস্ত্র বাংলায় তথা সমগ্র ভারতে সহায়ক ভূমিকা রাখে এবং একটি নবপ্রবর্তিত বিজ্ঞানশাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কোনো সামষ্টিক বিষয়ের অবস্থান জানতে হলে পরিসংখ্যানের ওপর আমাদের নির্ভর করতেই হবে। যেমন শুরুতেই বলেছি, আমি গ্রামার পড়েছি ১৫ পাতার মধ্যে ৭ পাতা। কিন্তু গোটা ক্লাসের হিসেব বলছে, পড়ুয়ারা ৬.৯ পৃষ্ঠা পড়েছে। ০.১ পৃষ্ঠা আমার কমে গেল। একেই বলা হয় স্ট্যাটিস্টিক্যাল লাই, যা তৃতীয় মিথ্যা নামে খ্যাত। তবু পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর না করে আমাদের উপায় নেই।

নতুন সুয়েজ খাল

১৫১ বছরের পুরোনো সুয়েজ খালের কথা আমরা সবাই জানি। মিশরের সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত এটি একটি কৃত্রিম সামুদ্রিক খাল। এটি ভূমধ্যসাগরকে লোহিত সাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। দশ বছর ধরে খননের পর পথটি ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। উত্তরে ইউরোপ থেকে দক্ষিণে এশিয়া, উভয় প্রান্তে পণ্যপরিবহণে সুয়েজ খাল পৃথিবীর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি জলপথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

যখন সুয়েজ খাল ছিল না, জাহাজগুলোকে আটলান্টিক মহাসাগর ধরে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল পেরিয়ে যেতে হত সেই উত্তমাশা অন্তরীপ, যার আরেক নাম কেপ অফ গুড হোপ। সেখান থেকে পেত ভারত মহাসাগরের দক্ষিণের লেজ। তারপর আফ্রিকার পূর্ব উপকূল বেয়ে ডান হাতে মাদাগাস্কারকে রেখে উত্তরের দিকে উঠলে একসময় দেখা যেত আরব সাগরের ঢেউ। পর্তুগিজ অভিযাত্রী ভাস্কো দ্য গামা ওই পথেই মালাবার উপকূলে পৌঁছেছিলেন।

খালটি উন্মুক্ত হওয়ার আগে কখনো কখনো জাহাজ থেকে পণ্য নামিয়ে মিশরের স্থলপথ অতিক্রম করে, ভূমধ্যসাগর হতে লোহিত সাগরে এবং লোহিত সাগর হতে ভূমধ্যসাগরে অপেক্ষমাণ জাহাজে পারাপার করা হত। এর ব্যাপ্তি ভূমধ্যসাগরের পোর্ট আবু সাঈদ হতে লোহিত সাগরের আল-সুয়েজ পর্যন্ত। ফার্দিনান্দ দে লেসেপ্স নামের একজন ফরাসি প্রকৌশলী এই খাল খননের উদ্যোক্তা। শুরুতে এর দৈর্ঘ্য ছিল ১৬৪ কিলোমিটার। ২০১০ সালের হিসেবমতো এর দৈর্ঘ্য ১৯০.৩ কিলোমিটার। লম্বা ইতিহাস পেরিয়ে খালটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এখন মিশর সরকারের হাতে। মিশরের সরকারি তহবিল সমৃদ্ধ করতেও খালটির ভূমিকা কম নয়।

দিন দিন জাহাজের সংখ্যাবৃদ্ধির চাপ নিতে পারছিল না দেড়শো বছরের পুরোনো এই সুয়েজ। তাই দরকার পড়ে নতুন সুয়েজ খালের।

নতুন সুয়েজ খাল হল সুয়েজ খালের একটি শাখা, যেটি নতুন করে

নির্মাণ করা হয়েছে সুয়েজ খালের সমান্তরালে। বলা হচ্ছে, এটি 'দ্বিতীয় লেন'। এ ছাড়া খালটিকে আরও গভীর এবং ৩৫ কিলোমিটারের মতো প্রশস্ত করা হয়েছে। ২০১৫ সালের ৬ অগাস্ট খালটি জাহাজ-চলাচলের জন্যে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তারপর থেকে খালটি দ্বিমুখী হয়েছে এবং জাহাজগুলোর অপেক্ষার সময় ১৮ ঘণ্টা থেকে ১১ ঘণ্টায় নেমে এসেছে। মিশর সরকার আশা করছে, দৈনিক ৭৬-টি থেকে বেড়ে ২০২৩ সালের মধ্যে এই খাল দিয়ে চলবে ৯৭-টি জাহাজ। ফলে ২০২৩ সাল নাগাদ সুয়েজ খালের বর্তমান আয় ৫৯০ কোটি মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ১৩২০ কোটি মার্কিন ডলার হবে বলে আশা করছে সরকার।

আফ্রিকা থেকে আসছি

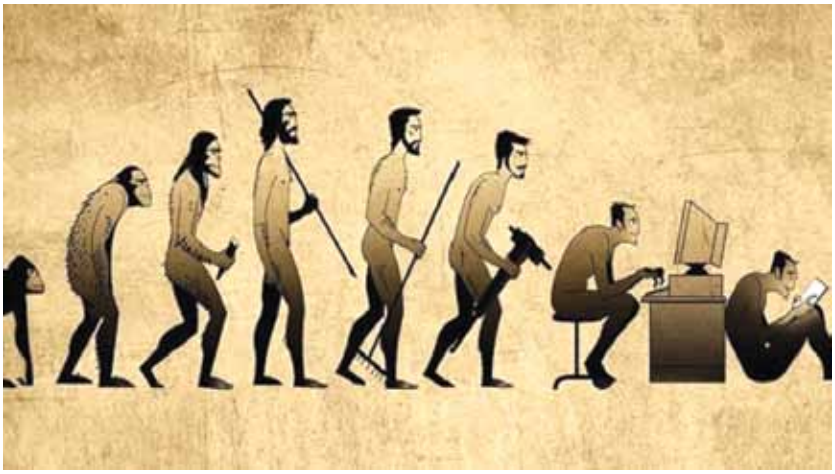

এই সেদিন, দু-হাজার উনিশ সালে, নৃতত্ত্ববিদরা সন্ধান পেয়েছেন— মানুষের আদি বাসস্থান ছিল আফ্রিকা। ইউরোপীয়, মঙ্গোলীয়, ভারতীয়, আরব, নিগ্রো বা আমাদের দেশের আদিবাসী সাঁওতাল— গাত্রবর্ণ বা নাক-মুখ-চোখ-চুল যেমনই হোক না কেন বা এখন যে-মহাদেশেই থাকুক না কেন, সবাই একদিন ছিল এক প্রজাতির। এবং তারা এসেছিল আফ্রিকা থেকে।

মানুষ চির-যাযাবর। ঐতিহাসিক কালে মানুষের অভিযাত্রার কথা আমরা পড়ার সুযোগ পেয়েছি। মধ্যযুগের ভূপর্যটক, ইতিহাসবিদ আর প্রত্নতত্ত্ববিদদের লেখায় এবং গবেষণায় জানতে পেরেছি— গ্রিকরা কী করে ইরান থেকে পশ্চিম ভারত পর্যন্ত ভূখণ্ডে একসময় বসবাস করেছিল। জানতে পেরেছি ভারতে শক, হূণ আর কুশানদের অভিবাসনের কথা।

কিন্তু মানুষ যখন লিখতে-পড়তে জানত না, মিশরে বা মেসোপটেমিয়ায় বা সিন্ধু-উপত্যকায় সভ্যতা যখন বিকশিত হয়নি, সেইসব যুগের কথা কী করে জানতে পারছি? পারছি ভূতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ আর প্রত্নতত্ত্ববিদদের নতুন নতুন আবিষ্কারে আর গবেষণায়।

পৃথিবীর বয়স প্রায় ৪৫৪ কোটি বছর। এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রাচীনতম প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেছে গ্রিনল্যান্ডে এক ধরনের শিলার অভ্যন্তরে, যা অন্তত ৩৭০ কোটি বছরের পুরোনো বলে মনে করা হয়েছে। ওই আদি প্রাণকে বলে সায়ানো ব্যাক্টেরিয়া। বিবর্তনের দীর্ঘ যাত্রায় এসেছে এককোষী আলগি, অনেক পরে এসেছে বহুকোষী প্রাণী। এসেছে স্তন্যপায়ী প্রাণী। শেষে এসেছে মানুষ।

ভূতত্ত্ববিদরা পৃথিবীর যুগবিভাগ করেছেন কোনো-একটি পর্যায়ে পাওয়া বিশেষ ফসিলের সাহায্যে। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ও তার বিবর্তনের রূপরেখা বুঝতে সেই সময়ের বিভিন্ন ফসিল সাহায্য করেছে। সমুদ্রের তলে, বরফের নীচে বা পাহাড়ের কোটরে রয়ে গেছে আদিম প্রাণের ফসিল। প্রাণ এল, জটিলতর প্রাণ এল। এল অমেরুদণ্ডী প্রাণী— পোকা, স্কুইড ইত্যাদি। তারপর একসময় এল মেরুদণ্ডী প্রাণী। একই সঙ্গে পৃথিবীর ভূপ্রকৃতিও পালটে গেছে। আগে ছিল একটাই ভূখণ্ড, পাঞ্জিয়া। ২০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর টেক্টোনিক প্লেটগুলির পরিবর্তনের কারণে সেই ভূখণ্ড ভেঙে গিয়ে মহাদেশগুলি গড়ে উঠেছে। মাটি ভেদ করে উঠেছে পাহাড়, পর্বত।

কখনো আবার কক্ষপথের সামান্য পরিবর্তনের ফলে পৃথিবী একটু কাত হয়ে গেছে। সেই অস্থায়ী কালে উত্তর গোলার্ধ কম সৌর-বিকিরণ পেয়েছে। তখন পৃথিবীতে এসেছে তুষার যুগ। একবার নয়, পৃথিবীতে বহুবার তুষার যুগ এসেছে। আজ থেকে মাত্র সাড়ে এগারো হাজার বছর আগে শেষ তুষার যুগের অবসান হয়। আসে হলোসিন যুগ।

এখন আমরা রয়েছি হলোসিন যুগে।

মাত্র ২০ কোটি বছর আগে প্রথম স্তন্যপায়ী জীবের আগমন হয়। সেই স্তন্যপায়ী থেকে মাত্র সাড়ে পাঁচ কোটি বছর আগে আসে প্রাইমেট। আনুমানিক ২৩ লক্ষ থেকে ২৪ লক্ষ বছর পূর্বে আফ্রিকাতে হোমো গণটি অস্ট্রালোপিকেথাস গণ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। হোমো গণে অনেক প্রজাতিরই উদ্ভব ঘটেছিল, যদিও একমাত্র মানুষ ছাড়া তাদের সবাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষের উদ্ভব আর বিকাশ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখন সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অনুকল্প হচ্ছে 'আউট অফ আফ্রিকা' বা 'আফ্রিকা থেকে বহির্গমন' অনুকল্প। যুগে যুগে আফ্রিকা থেকে মানুষের নানা প্রজাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন বিলুপ্ত মানব প্রজাতিগুলোর মধ্যে রয়েছে বহু পূর্বেই আফ্রিকা থেকে আসা হোমো ইরেক্টাস, যারা এশিয়ায় বাস করত এবং হোমো নিয়ান্ডার্টালেন্সিস, যারা ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ছড়িয়ে ছিল।

২০১৯ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত গবেষণা-অনুযায়ী আধুনিক মানুষের নিকটতম প্রজাতি প্রায় ২ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল এবং এর উৎপত্তিস্থল ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বতসোয়ানা। আর আধুনিক মানুষ, মানে বর্তমান প্রজাতি, মাত্র ৭০ হাজার বছর আগে এসেছে আফ্রিকা থেকেই। পায়ে পায়ে হেঁটে পৌঁছে গেছে এশিয়াতে, ইউরোপে। সেই থেকে পৃথিবীতে মানুষের জয়যাত্রা চলছে।

মহাকালের মানদণ্ডে ৭০ হাজার বছর অতি নগণ্য সময়। এই সামান্য সময়ে সে পৃথিবীর অন্য সমস্ত প্রাণীকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করেছে। আগুনকে পোষ মানিয়েছে। আবিষ্কার করেছে চাকা, লিপি। গড়ে তুলেছে মেসোপটেমিয়ায়, সিন্ধু নদের তীরে আর মিশরে বড়ো বড়ো সভ্যতা। আর এখন সে পৃথিবীর বাইরে মহাকাশযান পাঠাচ্ছে অন্য কোনো অপার্থিব 'মানুষের' সন্ধানে। ■

শিখরের কাছাকাছি যারা, যারা উজ্জ্বলতর জীবন-জীবিকার জগতে একদিন পৌঁছোবে অবশ্যই— সেই সম্ভাবনাময়দের নিয়ে এই পাতা। লিখেছেন

সেলিম মল্লিক

অসম্ভবের দুয়ার ভাঙার ইচ্ছা

সভ্যতার বুক থেকে আবিল অন্ধকার দূর করা 'অনেক মনীষীর কাজ' মনে করে জেগে ঘুমিয়ে থাকলে হবে না। মনীষীর হেঁটে চলার পথের সাথি হওয়ার সংকল্প গ্রহণের ভেতর দিয়েও আমাদের কিছু দায় পালনের ভূমিকা যে রয়েছে, তা অনুভব করতে হবে। যাঁরা এই অনুভবে উজ্জীবিত, তাঁরা মর্মে মর্মে বোঝেন মানুষের মুক্তি মানুষের হাতেই রাখা আছে। শুধু তার সঠিক ব্যবহার প্রয়োজন। আর প্রয়োজন তা ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলিকে যথাযথ বুঝে নেওয়া। মনে হয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রধান দুটি ক্ষেত্র পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে আছে। গভীর জ্ঞান, প্রেম আর করুণার আলোড়ন— এই ক্ষেত্রদুটির ফসল, সোনার ফসল। ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালি পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভেতরে, তাঁদের নতুন নতুনতর প্রজন্মের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বার্তা নিয়ে অনেকেই নিশ্চয় হাজির হয়েছেন, তবে বলাই বাহুল্য, আল-আমীন মিশন তাদের অগ্রগণ্য। নেহাত অগ্রগণ্য বললে হয়তো যথার্থ বলা হয় না, তাই বলা ভালো, সিংহভাগ দায়িত্ব যেন সে একাই নিজের কাঁধে নিয়েছে। এভাবেই এগিয়ে চলেছে তার অগ্রগতি, আদতে যা মানুষেরই অগ্রগমনের বিশেষ একটা মাত্রা। এখন আমরা কথা বলব এই প্রতিষ্ঠান— শিক্ষা ও সমাজভাবনার অনিরুদ্ধ এক প্রতিষ্ঠান আল-আমীন মিশনের চারজন পড়ুয়াকে নিয়ে। তারা এমন পড়ুয়া, যাদের অধ্যবসায়, যাদের স্বপ্ন, যাদের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা একটা গোটা জাতির, জাতীয় জীবনের মঙ্গালসাধনকেই সূচিত করতে চায়।

এ-বার আমরা বেছে নিয়েছি আল-আমীনের নয়াবাজ শাখার চারজন পড়ুয়াকে। তাদের মধ্যে দু-জন দ্বাদশ শ্রেণি এবং আর-দু-জন একাদশ শ্রেণিতে পড়ছে। চারজনেই বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। প্রথমে আসা যাক আল তৌফিকের কথায়। তৌফিক এখন দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ছে। মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর থানা অঞ্চলের লাহারপাড়ায় ২০০২ সালে জন্ম তার। বাবা মহম্মদ সাহাজাহান সেখ, বয়স ৪৫ বছর, মাধ্যমিক পাস, পুলিশের চাকরি করেন। মা হাশিদা বেগম বি.এ. পাস করেছেন। তৌফিকের আর-এক ভাই আছে, যে কিনা এখন ক্লাস নাইনের ছাত্র। তৌফিক, তার জন্ম যে-গ্রামে, সেই গ্রামের পার্শ্ববর্তী এক জায়গার একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ফোর পর্যন্ত লেখাপড়া করে ক্লাস ফাইভে গিয়ে ভর্তি হয় মিশনের পাথরচাপুড়ি শাখায়। এবং সেখান থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় ২০১৮ সালে। ৯৫ শতাংশের বেশি নম্বর পায় সে মাধ্যমিকে। বলবার মতো নম্বর বলতে অঙ্ক ও ভৌতবিজ্ঞানে পেয়েছিল ১০০-র মধ্যে ১০০ করেই। এরপর সে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয় নয়াবাজ শাখায়। এবং সামনেই তার উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা। অঙ্ক প্রিয়তম বিষয় হলেও, তার ভবিষ্যতের লক্ষ্য ডব্লিউ.বি.সি.এস. পরীক্ষায় সফল হয়ে পুলিশের পদস্থ অফিসার হওয়া। যদিও ডাক্তার হওয়ার সম্ভবনাকে সে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেয়নি। কথা বলে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছিল, যেহেতু তার বাবা পুলিশের পেশায় যুক্ত, হয়তো সেখান থেকেই জীবিকা হিসেবে ওই দিকে যাওয়ার

> মিশনের এই পরিবেশ আর সহায়ক ভূমিকা না থাকলে, তা কতদূর এত সহজে পেরে উঠতাম, সন্দেহ আছে। এখানে না এলে এই ইচ্ছা এমন গভীর প্রতিজ্ঞার রূপ নিত না।"

ইচ্ছে। কিন্তু আলাপ বিস্তারিত হতে বোঝা গেল আসল অভিপ্রায়। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নিজেকে নিযুক্ত রেখে জাতীয় জীবনের নানান দায় সে সামলাতে চায়। সে বিশ্বাস করে, এর মাধ্যমে দেশ, দেশের মানুষ, এমনকী নিজের সমাজপরিসরের মানুষজনের সঙ্গে নিজেকে অনেক নিবিড়ভাবে যুক্ত রেখে জীবনযাপনের আদর্শ ও নিষ্ঠাকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে। শুনতে শুনতে খুব আশান্বিত হচ্ছিলাম। সত্যিই তো, আমরা সাধারণ মানুষ, ওইসব ক্ষেত্রে এমন তাজা আর সৎ স্বপ্নের অভিযাত্রীকেই তো দেখতে চাই। তৌফিকেরা আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয় পূরণ করে দেবে একদিন-না-একদিন। এত কথার মধ্যে সে বার বার যা বলছিল, "এইসব একদিন সম্ভব হবে আশা রাখি, তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে চেষ্টা করছি। কিন্তু মিশনের এই পরিবেশ আর সহায়ক ভূমিকা না থাকলে, তা কতদূর এত সহজে পেরে উঠতাম, সন্দেহ আছে। এখানে না এলে এই ইচ্ছা এমন গভীর প্রতিজ্ঞার রূপ নিত না।" লেখাপড়ার বাইরে তৌফিকের আগ্রহ দুটি বিষয়ে— এক, সে জানতে চায় বিচিত্র মানুষের জীবনের বিচিত্র সব কাহিনি। বিখ্যাত অখ্যাত নানান মানুষের জীবনের নানান তরঙ্গ, সবই তার মনোযোগ আকর্ষণ করে। দুই, সে আর্ট ফিল্ম দেখতে পছন্দ করে। সব ফিল্মই তো আর্ট, কিন্তু মনে হয় সে বলতে চাইল, বাজারি বাণিজ্যিক ছায়াছবির বাইরে যেসব চলচ্চিত্র, তাদেরই কথা।

তৌফিকের সহপাঠী আমির সোহেল। জন্ম ২০০১ সালে। এও মুর্শিদাবাদ

জেলার সন্তান। নবগ্রাম থানার সাঁকোঘাটে বাড়ি। তার বাবা মিন্তাজুল সেক কৃষিজীবী মানুষ। মাধ্যমিক পাস মিন্তাজুল সেক নিজের জমিতেই কৃষিকাজ করে সংসার নির্বাহ করেন। জমি বলতে সব মিলিয়ে সাড়ে তিন বিঘের মতো, তাতে ধান গম ও সরিষা উৎপাদিত হয়। আমির সোহেলের মা সাইফুন্নেষা বিবি গৃহবধূ, ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছেন। আর আছেন এক দাদা, তিনি ভূগোলে অনার্স পড়ছেন এখন।

সোহেল চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে গ্রামের একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুলে। তারপর পঞ্চম শ্রেণির পড়াটাও সে পড়েছে গ্রামের পার্শ্ববর্তী একটি সরকারি হাই স্কুলে। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে আল-আমীন মিশনের ছাত্র। প্রথমে সুগড় শাখায়, ওখান থেকেই ২০১৮ সালে মাধ্যমিক দিয়ে ৯৩ শতাংশেরও বেশি নম্বর পায়। মাধ্যমিকে তার বিষয়ভিত্তিক সর্বোচ্চ নম্বর ছিল ৯৮। এবং অঙ্কে সে এই নম্বর পেয়েছিল। ২০২০-তেই তার উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা। বলা বাহুল্য, এখন মিশনের নয়াবাজ শাখায় দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র সে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় অঙ্কে সর্বোচ্চ নম্বর পেলেও রসায়ন তার প্রিয়তম বিষয়। ভবিষ্যতের লক্ষ্য নিয়ে প্রসঙ্গ উঠতেই মেধাবী এই ছাত্র ক্ষণমুহূর্তও বিলম্ব না করে সাফ জানিয়ে দিল ডাক্তার তাকে হতেই হবে। এবং স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ হওয়ার লক্ষ্যে সে ডাক্তারিবিদ্যার উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করবে বলে ইচ্ছে প্রকাশ করল। চিকিৎসাবিদ্যার এই শাখা অপেক্ষাকৃত জটিল ও সূক্ষ্ম, তাই সে এতেই উৎসাহী। জটিল ও সূক্ষ্ম কোনোকিছুর প্রতি তার বরাবরের আকর্ষণ। তা ছাড়া পূর্ব ভারত স্নায়বিক চিকিৎসাক্ষেত্রে তুলনায় এখনও পিছিয়ে।

অনেক কথার মধ্যেও মিশনের আন্তরিক, ঘরোয়া সহযোগী পরিবেশ এবং বন্ধু ও মাস্টারমশাইদের মমত্বের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল না। শুধু তা-ই নয়, মিশন নিয়ে কথা বলবার সময় উজ্জ্বল এই ছাত্রের মুখেচোখে আবেগের ঢেউ খেলছিল। সত্যিই তো তা-ই হওয়ার কথা। স্নেহ দিয়ে, নিবিড় মায়া দিয়ে মিশন এদের মায়ের মতো আগলে বসে থেকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে চাইছে প্রাণপণ। লেখাপড়া ছাড়া সোহেল গভীর আকর্ষণ বোধ করে কথাসাহিত্য পড়তে। বিভূতিভূষণ তার অবসরের আশ্রয়।

এবার একাদশ শ্রেণির দু-জন পড়ুয়া সম্পর্কে কিছু কথা বলা যাক। আগেই বলেছি বর্তমান লেখার আলোচ্য চারজন পড়ুয়াই নয়াবাজ শাখার। পার্থক্য শুধু শ্রেণিতে। একাদশ শ্রেণির ছাত্র মহম্মদ আযীম আরশাদের জন্ম ২০০৩ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার তেঘরি আহম্মদপুরে। তার বাবা মহম্মদ আবু বাক্কার হোমিয়োপ্যাথ ডাক্তার হিসেবে সরকারি চাকরি করেন। মা শামিমা খাতুন হাই স্কুলের প্যারাটিচার। আরশাদের এক দাদা আছেন, যিনি কম্প্যুটার সায়েন্স বিষয়ে বি.এসসি. অনার্স পড়ছেন। পারিবারিক অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে, এই পরিবারে লেখাপড়ার ভালোরকম চল আছে। আর্থিকভাবেও আরশাদের পরিবার প্রান্তবর্গীয় নয়। তবুও আরশাদ তার লেখাপড়ার বর্তমান অগ্রগতির জন্য বিশেষভাবে আল-আমীন মিশনের প্রতি তার ঋণ স্বীকার করছিল বার বার। আসলে যা হয়, মেধা আছে, কিন্তু তার স্ফুরণ ঘটার জন্য অনুকূল পরিমণ্ডল না পেলে তা সুপ্তই থেকে যায়। আল-আমীন আরশাদের মতো পড়ুয়াদের এই পরিবেশ দিয়ে তাদের বিকাশকে অবারিত করে রেখেছে। আরশাদ বাড়ির পরিবেশ আর মিশনের পরিবেশের মধ্যে এমন কিছু মৌলিক তফাতের কথা বলছিল, যা একজন পড়ুয়ার অধ্যবসায়স্পৃহাকে কত গুণ যে বাড়িয়ে দেয়, মিশনে না এলে যা তার পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব হত। এই আরশাদ তার গ্রামের একটি প্রাইভেট স্কুলে ক্লাস ফোর পর্যন্ত লেখাপড়া করে ফাইভ থেকে টেন পর্যন্ত মিশনের মহম্মদপুর শাখায় পড়ে। মহম্মদপুর শাখা থেকে ২০১৯ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ৯৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে পাস করে। বিষয়ভিত্তিক তার সর্বোচ্চ নম্বর ছিল জীবনবিজ্ঞানে—১০০। বর্তমানে বিজ্ঞান বিভাগের এই ছাত্র ২০২১ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার নয়, সে হতে চায় বিজ্ঞানের নিবিড় গবেষক। পদার্থবিদ্যার উচ্চতর গবেষণায় নিয়োজিত থেকে বুঝে নিতে চায় বস্তুসমূহের গভীরে নিহিত তাদের বিচিত্র সম্ভাবনা ও রহস্য। অবসর সময়ে আরশাদ তার বাবার হোমিয়োপ্যাথির বই পড়তে পছন্দ করে, এটা তার এক বিরল শখ।

এ-বারের মতো শেষ করব উম্মে হানির কথা বলে। মিশনের নয়াবাজ শাখার একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের এই পড়ুয়ার জন্ম ২০০২ সালে। জন্মস্থান মালদা জেলার কালিয়াচক থানার সাদিপুর কবিরাজটোলা। উম্মে হানির বাবা মধুর ব্যাবসা করেন। আমরা জানি, ইংরেজি হানি কথাটির বাংলা অর্থ হল মধু। বাবা নিশ্চয় সাধ করে সন্তানের এমন নাম রেখেছেন। এই উপলক্ষে বলতে ইচ্ছে করছে, উম্মে হানির স্বভাবের মধুরতাও তার নামকে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছে। উম্মের মা সাকিলা বানু গৃহবধূ। তার এক দিদি এখন হোমিয়োপ্যাথি ডাক্তারি পড়ছেন। আর আছে এক ভাই, যে কিনা ক্লাস থ্রির ছাত্র।

উম্মে হানি মহব্বতপুর কচিকাঁচা মিশনে ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত পড়েছে। তারপর, অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে আল-আমীনের ছাত্র। প্রথমে বেলপুকুর শাখা, ওখান থেকেই ২০১৯ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পায় ৯৪ শতাংশের বেশি নম্বর। অঙ্কে ছিল তার বিষয়ভিত্তিক সর্বোচ্চ নম্বর—৯৯। পদার্থবিদ্যা প্রিয়তম বিষয় হলেও, ডাক্তার হওয়া তার আগামীর লক্ষ্য। তারও কথায় বার বার ফুটে উঠছিল মিশনের পরিকাঠামো ও পরিচালনার আনুকূল্য। ২০২১ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক দেবে সে। এখন থেকে মিশনের শিক্ষকমহাশয়রা যে-মমতায় তার, তার অন্য সহপাঠীদের প্রস্তুতির প্রেরণা জুগিয়ে চলেছেন, তা বিরল, হয়তো সাশ্রয়ী অর্থে বিরলতম।

এদের সঙ্গে কথা বলে তৃপ্ত। তৃপ্ত, কারণ এদের সীমাহীন প্রত্যয় আমাকে আহ্লাদিত করেছে। এমন প্রত্যয় থাকলে এ-পৃথিবীতে কত কী-না সম্ভব। এরাও অসম্ভবের দুয়ার ভেঙে দেবে একদিন, সেই ইচ্ছাই আন্দোলিত হচ্ছে সারাদেহমনে। ■

জলে যে কত রকমের প্রাণী জন্মায় আর বাস করে তার হিসেব পাওয়া ভার। তাদের জীবন, স্বভাব, আকার, বর্ণ— সবই বিচিত্র ও বিভিন্ন। জলজ ওইসব প্রাণীদের ঘিরে মানুষের অন্তহীন জিজ্ঞাসা। এই পাতা সেই জিজ্ঞাসু মনের উপহার।

পটকা বা বহুরুপী

এন জুলফিকার

আমি তখন খুব ছোট্ট। আমাদের গ্রামের বাড়ির সামনেই ছিল একটা মাঝারি আকৃতির পুকুর। সে-পুকুরে তখন প্রচুর মাছ থাকত। আমরাও ছুটির দিনে মায়ের সঙ্গে আটা বা পাঁউরুটি দিয়ে বানানো টোপ নিয়ে হাতছিপে মাছ ধরতে বসতাম। জলের ওপর ভেসে থাকা ময়ূরের পাখনা দিয়ে বানানো টিকলি একটু ডুবলেই দিতাম এক হ্যাঁচকা টান। আর বেশিরভাগ সময়ই দেখতাম ছোট্ট বঁড়শিতে আটকে শূন্যে ঝুলছে একটি ডিমভরা পুঁটি বা ট্যাংরা মাছ, কখনো কখনো ছোটো রুই বা মৃগেলও। উফ্, তখন যে কী আনন্দ হত! আমার মা খুব দ্রুত মাছ ধরতে পারত ছিপে। মা ছিপ নিয়ে পুকুরপাড়ে বসলেই আমরা জানতাম ঘণ্টা খানেকের মধ্যে অনেক মাছ ধরে ফেলবে মা। ঘটতও তা-ই। ভাই-বোনদের সঙ্গে খেলার ফাঁকে দেখতাম ছোটো বালতির আধ বালতির বেশি মাছ ধরে নিয়ে মা ঘরে আসছে।

কোনো কোনো দিন আব্বা মা বা কোনো কাজের লোক জালও ফেলত পুকুরে। মাছ ধরার সময় রুই-কাতলার পাশাপাশি পুকুরে জন্ম নেওয়া মৌরলা, পুঁটি, ট্যাংরা, খলসে, চ্যালা, কই, ন্যাদোস, চাঁদা মাছও প্রচুর পরিমাণে ধরা পড়ত জালে। তখন তো আর এখনকার মতো এত রাসায়নিক সার ও বিষের ব্যবহার ছিল না। ফলে পুকুর, খাল বা বিলে এবং বর্ষাকালে ধানজমিতে প্রচুর মাছ জন্মাত। তো তেমনই এক মাছ ধরার দিন জালে ধরা পড়ল এক অদ্ভুতদর্শন মাছ। মাছটা দেখতে ছোট্ট, কিন্তু জাল টেনে ডাঙায় তুলতেই সেটা আস্তে আস্তে একটা বলের মতো আকৃতির হয়ে গেল। তার দেহে, মূলত পেটের দিকে অসংখ্য কাঁটা। আর পিঠের দিকের রং কালচে সবুজ, তাতে সাদা ছিটছিটে দাগ। মাছটা যেন অপার বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার গোল গোল দু-চোখের মাঝে ঈষৎ উঁচু নাক আর ছোট্ট একটা মুখ। হাতে নিয়ে পেটে চাপ দিলেই মাছটা অদ্ভুতরকম ক্যাঁ-কোঁ আওয়াজ করছিল। আমরা

তো এমন কিম্ভূত মাছ দেখে খুব ঘাবড়ে গেলাম। কেউই তখন মাছটার সঠিক নাম বলতে পারল না। তবে একজন বলল, "এটা কিন্তু খুব বিষাক্ত। এক্ষুনি ফেলে দাও ওটা।"

তারপর ওই মাছটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। অনেক পরে একদিন এক মাছের আড়তের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেই বহুদিন আগে দেখা মাছটাকে পথের পাশে পড়ে থাকতে দেখলাম। একটু কৌতূহলে ওখানে থাকা জেলেদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদা, এই মাছটার কী নাম বলতে পারেন?" তিনি বললেন, "ভালো নাম কী, তা তো জানি না দাদা। তবে আমরা একে পটকা মাছ বলি। আবার কেউ কেউ একে ট্যাঁপা মাছও বলে।"

পটকা? ট্যাঁপা? এ কী অদ্ভুত নাম! পরে পরে জানলাম সে-মাছের ইংরেজি নাম পাফার ফিশ। এর পাশাপাশি কেউ কেউ একে বেলুন ফিশ, বাবল ফিশ, ব্লো ফিশ বা গ্লোব ফিশও বলে। এ-মাছের বৈজ্ঞানিক নাম টেট্রাওডনটাইডি। আসলে পাফার ফিশ বা পটকা মাছ হল টেট্রাওডন্টিফর্মস বর্গের টেট্রাওডনটাইডি পরিবারভুক্ত মাছ। নামগুলো একটু খটোমটো লাগছে কি? হবেই তো, এ তো আর আমাদের চেনা দেশি মাছ নয়। আমাদের মধ্যে কেউ তার বাংলা নামকরণ করেছে মাত্র। পটকা মাছের বা বলা ভালো পাফার ফিশের কয়েকটি প্রজাতি হল— ভ্যালেনটিন শার্পনোজ পাফার, সাউদার্ন পাফার, ব্লু স্পটেড পাফার, গ্রিন স্পটেড পাফার, স্টেলেট পাফার, এমবু পাফার, ফাহাকা পাফার, ডোয়ার্ফ পাফার, নর্দার্ন পাফার, হোয়াইট স্পটেড পাফার, ব্ল্যাক স্পটেড পাফার, ব্লান্টহেড পাফার, চেকারড পাফার, ব্যান্ডটেল পাফার, ক্যানথিগ্যাসটার পাফার, কোলোমেসাস অ্যাসিলাস পাফার, অ্যারোথ্রোন পাফার প্রভৃতি। সাধারণত একটু লবণাক্ত জলে এদের বাস। তবে পরিষ্কার মিষ্টি জলেও কয়েক প্রজাতির পাফার ফিশের দেখা মেলে। সারাপৃথিবীতে প্রায় ১২০ প্রজাতির পাফার ফিশ বা পটকা মাছ আছে। তার মধ্যে ২৯-টি প্রজাতি তাদের সম্পূর্ণ জীবনকালটাই পরিষ্কার জলে কাটায় এবং এদের বেশিরভাগটাই, প্রায় ২৫-টি প্রজাতির বাস দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চীন, জাপান, ভারত, বাংলাদেশ, কোরিয়া, থাইল্যান্ড ও আরও কয়েকটি দেশে। বাকি প্রজাতিদের বাস সমুদ্রের লবণাক্ত জলে।

এরা সাধারণত খুব বড়ো হয় না। দৈর্ঘ্য সাধারণত ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি। তবে দু-একটি প্রজাতির পাফার ফিশ প্রায় তিন থেকে চার ফুটের মতো বড়ো হয়। এরা উষ্ণ জলের মাছ, তাই যেখানে জল ঠান্ডা এ-মাছ সেখানে পাওয়া যায় না। সবচেয়ে বড়ো প্রজাতির পটকা মাছ হল স্টেলেট পাফার, দৈর্ঘ্যে প্রায় চার ফুট। আফ্রিকা ও জাপানের উপকূলবর্তী সমুদ্রে এদের বাস। আর সবচেয়ে ছোটো প্রজাতির পটকা মাছ হল ডোয়ার্ফ পাফার, তারা মাত্র ইঞ্চি খানেক লম্বা। ভারতের কেরালা রাজ্যের পম্বা নদীতে মূলত এদের বাস। তবে লম্বায় সবচেয়ে ছোটো হলে কী হবে, তারা এক আশ্চর্য কেরামতি জানে! তারা ইচ্ছে করলেই পুং-মাছ থেকে স্ত্রী-মাছ, বা স্ত্রী-মাছ থেকে পুং-মাছে রূপান্তরিত হতে পারে।

পটকা? ট্যাপা? এ কী অদ্ভুত নাম! পরে ভাবলাম, সে-মাছের ইংরেজি নাম পাফার ফিশ। এর পাশাপাশি কেউ কেউ একে বেলুন ফিশ, বাবল ফিশ, ব্লো ফিশ বা গ্লোব ফিশও বলে। এ-মাছের বৈজ্ঞানিক নাম টেট্রাওডনটাইডি।

কোনো কোনো পাফার ফিশ, যেমন হোয়াইট পাফার ও মাস্কেড পাফার মাটির নীচে বাসা বানায়! এই দুই প্রজাতির পুং-মাছ বালি খুঁড়ে প্রায় তিন ফুট ব্যাসার্ধের গোলাকার ঘর বানায় আর সেখানে স্ত্রী-মাছ গোলাকৃতি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পরে পরেই ডিমের চারপাশে একটা শক্ত খোলস গড়ে ওঠে। পুং-মাছেরা পালা করে তা পাহারা দেওয়ার চার-পাঁচ দিন পর তারা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে নিজেরা খাবার খুঁজে নেওয়ার মতো সমর্থ হয়ে ওঠে।

পটকা মাছের মাত্র চারটি দাঁত আছে। ওপরে দুটি, আর নীচে দুটি। সেগুলো এমনভাবে জুড়ে থাকে যে, তা সুঁচালো ঠোঁটের মতো দেখায়। এরা সর্বভুক। পাফার ফিশের প্রধান খাদ্য হল শ্যাওলা, শামুক, ঝিনুক, সামুদ্রিক ছোটো ছোটো পোকামাকড়, কোরাল এবং ছোটো ছোটো মাছ।

পটকা মাছ সাধারণত ধীরে ধীরেই সাঁতার কাটে। তবে প্রয়োজন পড়লে এরা মুহূর্তে এদের গতিবেগ বাড়িয়ে ফেলতে পারে। তখন এদের লেজ রাডারের মতো কাজ করে আর লেজের ছোটো পাখনা অতি দ্রুত তার সাঁতারের গতিবেগ বাড়িয়ে দিতে পারে। এদের দৃষ্টিশক্তিও অসাধারণ। ফলে শত্রুর নাগাল এড়িয়ে এরা সহজেই পালাতে পারে। শত্রুর হাত থেকে পালানোর জন্য এদের আর-একটি উপায় হল— শত্রু সামনে এলেই এরা এদের ইলাস্টিকের মতো পাকস্থলিতে প্রচুর পরিমাণে জল ঢুকিয়ে বা বাতাস ভরে তাদের দেহকে প্রায় তিন গুণ বড়ো করে একেবারে একটা বলের মতো গোল বানিয়ে ফেলে। আর দেহের কাঁটাগুলো সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে ওঠে। ফলে অন্যরা সহজেই এর আকৃতি দেখে ভয় পেয়ে যায়। তার পরেও যদি সামুদ্রিক কোনো প্রাণী তাকে খেয়ে ফেলে তাহলে নিজের অজান্তেই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে তারা। কারণ, পাফার ফিশ হল মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে গোল্ডেন পয়জন ফ্রগের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিষধর প্রাণী। এদের শরীরে থাকে মারাত্মক টেট্রোডোটক্সিন বিষ বা টিটিএক্স। এই টিটিএক্স সায়ানাইডের চেয়ে ১২০ গুণ বেশি বিষাক্ত। পুং-মাছের চেয়ে স্ত্রী-মাছের শরীরে বেশি বিষ থাকে। বলা হয় একটি মাঝারি মাপের পাফার ফিশের শরীরে যে-পরিমাণ বিষ থাকে, তা ৩০ জন মানুষকে মেরে ফেলার জন্য যথেষ্ট। এই টিটিএক্স এত মারাত্মক যে, আমাদের শরীরের বুক ও

পেটের মাঝে যে মধ্যচ্ছদা বা ডায়াফ্রাম আছে, তা অসাড় হয়ে তীব্র শ্বাসকষ্টশুরু হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু না হলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। এর পাশাপাশি বমি ও মাথা ঘোরা শুরু হয়, হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়, শরীরের রক্তচাপ কমে, সারাশরীরের মাংসপেশি অসাড় হয়ে যেতে থাকে। সাধারণত পাফার ফিশের ত্বক, লিভার, ডিম্বাশয় ও অন্ত্রে থাকে এই মারাত্মক বিষ। আর পাফার ফিশের লার্ভার ক্ষেত্রে ত্বকের উপরিভাগে থাকে এই টিটিএক্স। ফলে শত্রুর হাত থেকে তারা রক্ষা পায়।

আমরা মাছ বলতে যে-ধরনের প্রাণীকে বুঝি, পটকা মাছ আদৌ কি তা-ই? তাই মৎস্যবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করেন, পটকা মাছ আসলে মাছ নয়, তা এক বিষাক্ত জলজ প্রাণী। তবে, সব পাফার ফিশ কিন্তু বিষাক্ত হয় না। দু-একটি প্রজাতির পটকা মাছের শরীরে বিষের পরিমাণ নিতান্তই কম। তবে কোন পাফারে বিষ কম, তা চেনা কিন্তু বেশ মুশকিল। অন্তত সাধারণ মানুষের পক্ষে তা চেনা বেশ কঠিন।

জাপানে এ-মাছের নাম ফুক্ত। অতি উৎসাহী মানুষ কত কিছুরই-না স্বাদ চেখে দেখতে পছন্দ করে! জাপানের কিছু অভিজাত রেস্তরাঁয় পাফার ফিশ দিয়ে তৈরি পদ বা স্যুপ পাওয়া যায়। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শেফ বা রাঁধুনিই কেবলমাত্র ওই পদ রান্না করতে পারেন। তাঁরা বিশেষ পদ্ধতিতে পাফার ফিশের শরীরের যাবতীয় বিষ বের করে, তা রান্না করে থাকেন। তবে তাতেও কিছু ঝুঁকি থেকেই যায়। অতি উৎসাহীরা অনেক দাম দিয়ে সেই খাবার খায়। জাপান সরকার যদিও এই মাছ না খাওয়ার জন্য ব্যাপক প্রচার চালায়। থাইল্যান্ডে একে পাক পাও বলা হয়। সেখানে অনেকে মাছ চিনতে না পেরে ভুল করে খেয়ে ফেলে আর হাসপাতালে দৌড়োতে হয়। কেউ কেউ এর মারাত্মক বিষের প্রভাবে মারাও যায়। ফিলিপিন্সে একে বুটেট বলে। যদিও সেখানে এই বিষাক্ত মাছ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ফলে সাধারণ মানুষ এই মাছ খায় না। আর খেলেও যাবতীয় নিয়ম মেনে খায়।

মজার ব্যাপার হল, পটকা মাছ তার দুটি চোখ ইচ্ছেমতো দু-দিকে ঘোরাতে পারে এবং কোনো কোনো প্রজাতির পটকা মাছ শত্রুর মুখোমুখি হলে গিরগিটির মতো তাদের দেহের রংও বদলে ফেলে! আর তোমরা জানলে আশ্চর্য হবে, টেট্রাওডনটাইডি গোত্রের এই মাছের ফসিল পরীক্ষা করে জানা গেছে, তারা এই পৃথিবীতে দশ থেকে তেরো কোটি বছর ধরে বসবাস করছে!

এবার জোভানা মারকেলিকের লেখা একটা ছোট্ট গল্প দিয়ে এ-লেখার ইতি টানি। অনেক দিন আগে জলের নীচে বাস করত পুফি নামের এক পাফার ফিশ। সে খুব লাজুক, পারতপক্ষে কারো সঙ্গে কথাই বলত না। ফলে তার কোনো বন্ধুও ছিল না। স্কুলের অনেকেই তাই তাকে মোটু ও আরও আজেবাজে নামে ডাকত আর হাসাহাসি করত। একদিন সে যখন স্কুল থেকে ফিরছে, দেখল, তারই ক্লাসের একটা ছোট্ট নীল মাছকে একটা হাঙর তাড়া করেছে। আর মাছটা চিৎকার করছে, "বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।" কিন্তু কে তাকে হাঙরের হাত থেকে বাঁচাবে! সবাইকে অবাক করে তাকে বাঁচাতে এগিয়ে গেল পুফি। সে তিরের বেগে হাঙরের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর শরীর ফুলিয়ে তার গায়ের ধারালো বিষাক্ত কাঁটা সে হাঙরের গায়ে ফুটিয়ে দিল। মারাত্মক বিষের কারণে হাঙরও তো পুফিকে ভয় পায়। পাছে পাফার ফিশের বিষে তার কোনো ক্ষতি হয়, এই ভয়ে হাঙরটা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে গেল। সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া নীল মাছটা এবার পুফির দিকে এগিয়ে এল। "অনেক ধন্যবাদ, পুফি।" নীল মাছটা পুফিকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আমরা তোমাকে কত অপমান করেছি, গালি দিয়েছি, তবু তুমি কী অসীম সাহসে আমাকে হাঙরের হাত থেকে বাঁচালে! তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, পুফি। আর-কোনোদিন তোমাকে বিরক্ত করব না। তুমি কি এখন, প্লিজ, আমাদের বাড়ি যাবে আর আমার সঙ্গে খেলবে?" আনন্দে লাফাতে লাফাতে পুফি তার নতুন বন্ধুর বাড়ি গেল এবং তারা সারাদিন ধরে খেলল।

পরের দিন থেকে স্কুলে সে আর একা, নিঃসঙ্গ নয়। সবাই তাকে ঘিরে ধরে আনন্দ করতে লাগল। লাল মাছ, নীল মাছ, হলুদ মাছ, সাদা মাছ— সব্বাই তার বন্ধু। নীল মাছকে হাঙরের হাত থেকে বাঁচিয়ে পুফিই তো এখন স্কুলের আসল হিরো! ■

এটি নানান টুকরো টুকরো বিভাগের সমন্বয়। বই, মহাকাশ— কী নেই! রত্নে ভরা আলিবাবার গুহা যেন।

বইভব

অন্য এক রেনেসাঁস: আরবি-ইসলামীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ। সুমিতা দাস। পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা।

বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের অনন্য পরম্পরা

মুসলমানের আজ যে-দশা হয়েছে, তা দেখে কারো পক্ষে অনুমান পর্যন্ত করা সম্ভব নয় যে, অষ্টম থেকে প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানেরা কেবল দেশ জয় করে বিশ্বজুড়ে ইসলামই প্রতিষ্ঠা করেনি, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শনের মতো জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছিল। আজ বিজ্ঞানের যে-প্রাপ্তিগুলোকে ইউরোপীয়দের কৃতিত্ব বলে দাবি করা হয়, তার অনেকটাই সে-যুগের মুসলমানদের কীর্তি। মাত্র কয়েক শতকের মধ্যে মুসলমানদের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গিয়েছে বিশ্বজুড়ে তার ক্ষুধার্ত এবং ধর্মসর্বস্ব বিপুল জনসংখ্যা, তাদের অমুসলমান দেশে অভিবাসনের ঢল আর ভয়াবহ ভ্রাতৃঘাতী খুনোখুনি। ইসলামের সেই সোনালি দিনের কথা আজকের মুসলমানেরাও কি মনে রেখেছে? চারশো বছর ধরে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় ইসলামের অবদান কিন্তু ভোলার নয়।

ইসলামের ওই সোনালি দিনের না-জানা কথা মনে করিয়েছেন সুমিতা দাস তাঁর 'অন্য এক রেনেসাঁস: আরবি-ইসলামীয় সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ' বইয়ে। এমন একটা ইতিহাস কোনো শিক্ষিত মানুষের না-জানার কথা নয়। তাহলে আমরা জানি না কেন? কারণ, আমাদের পাঠ্য ইতিহাসের বইয়ে মুসলমানের এইসব উজ্জ্বল সময়ের কথা থাকে না। সাতকাহন করে লেখা থাকে তথাকথিত যুদ্ধবাজ হানাদার আর দখলদার মুসলমান সুলতানদের কথা। লেখক বলেছেন, "প্রায় এক হাজার বছরের এই চাপা-পড়া ইতিহাস।" মুসলমানের এই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস চাপা দিয়ে রাখার সচেষ্ট প্রয়াস অবশ্যই ছিল এবং আজও আছে। কিন্তু মুসলমান কেন তা মানুষকে জানানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হয়নি? সে ব্যস্ত থেকেছে তার ইসলামের যুক্তিবাদ আর বিজ্ঞানের পরম্পরাকে দূরে সরিয়ে রেখে সুন্নতের খাঁটি অনুসারী হয়ে উঠতে। সেই ধর্মান্ধ যুক্তিহীন অনুসরণ থেকে তার নিস্তার নেই— নানা ফেরকার ইসলামি সংস্কারবাদী আন্দোলনের জনপ্রিয়তার বহর দেখে তা টের পাওয়া যায়। অতীতচারী এইসব আন্দোলনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক নেই।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ১৯৩২ সালে সভাপতির অভিভাষণে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় ইসলামের কীর্তি বিষয়ে দীর্ঘ ভাষণ শেষ করেন এইভাবে, "আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই ... কিন্তু জ্ঞানরাজ্যে ইসলামের কীর্তিমালার বর্ণনার জন্য ইহা যথেষ্ঠ নহে। এরূপ মহিমাময় চিত্রের শোভা এবং মোহ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা সুকঠিন, এরূপ চিত্র জগতের যেকোনো জাতির পক্ষে গৌরবজনক। আমাদের কিন্তু অতীতের কীর্তিগাথা আলোচনা করলেই চলবে না, পূর্বপুরুষের গৌরব স্মরণ করিয়া সন্তোষ লাভ করা দুর্বলতা বিশেষ এবং নিরর্থক ভাবপ্রবণতার পরিচায়ক। ... আমাদিগকে তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে হইবে এবং সেই প্রেরণা, সেই অবাধ সত্যানুসন্ধান, সেই জাতিদেশনির্বিশেষে উন্মুক্ত চিত্তে জ্ঞানাহরণ, যাহা ইসলামকে তাহার উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছিল, সেইভাবে আমাদিগকে বিভোর হইতে হইবে।"

ইংরেজিতে বেশ কিছু বই থাকলেও ইসলামি স্বর্ণযুগের অর্জনগুলো নিয়ে বাংলা বই দুর্লভ। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সৈয়দ সামসুল আলমের 'ইসলামি সভ্যতায় উদ্ভাবন ও আবিষ্কার' বইটি তথ্যসমৃদ্ধ। সে-যুগের উদ্ভাবন আর আবিষ্কারগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলেও সেই সময়ের ইতিহাস তেমন করে ধরা হয়নি তাঁর বইয়ে। সময়টা যে গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যায় জে ডি বার্নালের বিখ্যাত গ্রন্থ 'সায়েন্স ইন হিস্ট্রি'-তে। তিনি ইসলামি বিজ্ঞানের মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে 'মুহাম্মদ ও ইসলামের অভ্যুদয়' নিয়ে অধ্যায় রচনা করেছেন। সুমিতা দাসের বইটি চমৎকার এবং অনেকটাই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সুমিতার এ-বই পড়লে নিজেদের অজ্ঞতা প্রকট হয়। লেখকের ছোটোবেলায় প্রশ্ন ছিল,"আরবরা কেন হঠাৎ প্লেটো, অ্যারিস্টটলের বই অনুবাদ করতে গেল?" এমন কত প্রশ্নের জবাব রয়েছে এ-বইয়ে।

গ্রিক বিদ্যাচর্চার সঙ্গে ইসলামি বিদ্যাচর্চার সম্পর্কটা অনেকটাই প্রত্যক্ষ ও স্বীকৃত। প্রাচীন গ্রিক পুরাণের প্রতি মুসলমান পণ্ডিতদের কোনো আবেগ ও সহমর্মিতা না থাকায় গ্রিক পণ্ডিতদের তুলনায় মুসলমানরা অনেক নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব নিয়ে গ্রিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করতে পেরেছিলেন। ইসলামি বৈজ্ঞানিক রচনায় যুক্তিশাসিত পরিচ্ছন্নতা

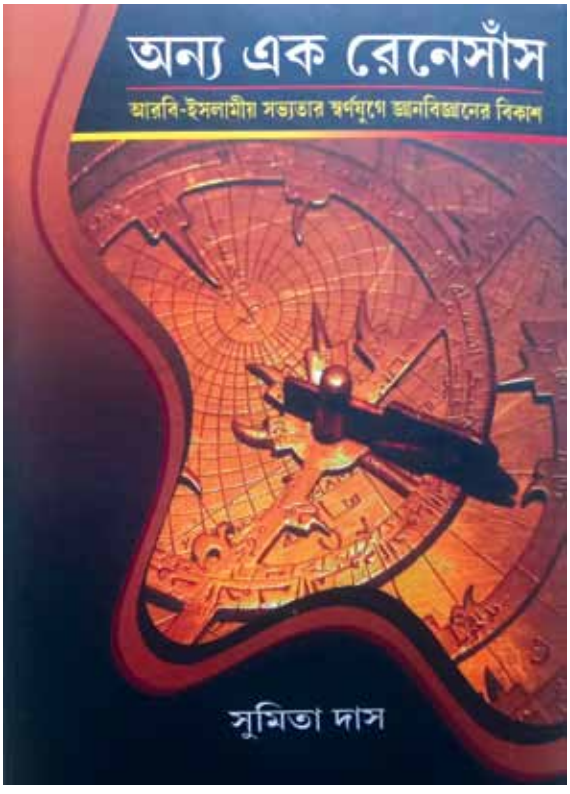

রয়েছে, তা দেখে অবাক হতে হয়। ওই পরিচ্ছন্নতাই আধুনিক বিজ্ঞানের চরিত্রলক্ষণ বলে স্বীকৃত।

আদি যুগের বিজ্ঞানের প্রধান যে দুই রহস্যাচ্ছন্ন অতীন্দ্রীয়বাদী রূপ, অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্র আর অ্যালকেমি, তা নিয়ে আরবরা যথেষ্ট মাতামাতি করা সত্ত্বেও আল কিন্দি, আল রাযি এবং আভিসেন্না (ইবন সিনা) প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ইসলামি বিজ্ঞানীরা সুস্পষ্ট ভাষায় ওইসব মেকি বিজ্ঞানের অতিরঞ্জিত দাবিগুলোকে খারিজ করে দিয়েছেন।

ধ্রুপদি যুগের শেষ দিকে বিজ্ঞানীদের সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে ইসলামি বিজ্ঞানচর্চার আদি যুগের বিজ্ঞানীদের সামাজিক অবস্থানের মূলত কোনো তফাত ছিল না। আব্বাসি রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অল্প কিছুকাল— ৭৪১ থেকে ৮৬১ পর্যন্ত— বিজ্ঞানচর্চাকে যেভাবে মদত দেওয়া হয়, তা আলেকজান্দ্রিয়ার সংগ্রহশালার আদি যুগের পর আর দেখা যায়নি। ওই পর্বে আল মনসুর, হারুন আল রশিদ, আল মামুন, এমনকী ঘোর ধার্মিক আল মুতাওয়াক্কিল প্রমুখ খলিফা বিজ্ঞানকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করেন। স্পেনের কর্ডোভাতে উমাইয়া খলিফাদের শাসনকাল (৯২৮-১০৩১) এবং স্পেন ও মরক্কোয় তৎপরবর্তী ছোটো ছোটো আমিরদের শাসনকালেও বিজ্ঞানকে বিশেষভাবে মদত দেওয়া হয়। এমনকী মুসলমান সংস্কৃতির অবক্ষয়ের যুগেও সালাদিন, গজনির মামুদ, সমরখন্দের উলুঘ বেগ প্রমুখ উচ্চাভিলাষী শাসকরা বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষণা করে গর্ববোধ করতেন। শুধু শাসকরা নন, ধনী বণিক এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও বিজ্ঞানীদের ভরণপোষণ করতেন। কেউ কেউ বিজ্ঞান নিয়ে মাথাও ঘামাতেন। ইসলামি বিজ্ঞানচর্চার এই ধর্মনিরপেক্ষ ও বাণিজ্যনির্ভর পটভূমিটি মধ্যযুগে খ্রিস্টান দুনিয়ার বিজ্ঞানচর্চার পটভূমি থেকে খুবই স্বতন্ত্র, কেননা, খ্রিস্টান দুনিয়ায় বিজ্ঞানচর্চা ছিল প্রায় পুরোপুরি চার্চ নিয়ন্ত্রিত। ইসলামি বিজ্ঞানের এই পটভূমির সঙ্গে বরং রেনেসাঁস যুগের মিল রয়েছে। রাজসভার এবং ধনী ব্যক্তিদের এই পৃষ্ঠপোষণা ছিল বলেই ইসলামি ডাক্তার আর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ও পর্যবেক্ষণ চালাতে পেরেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ধর্মান্ধ লোকেরা যখন এই বলে সোরগোল তুলল যে, এইসব দর্শনের চর্চা ভক্তদের ভক্তি টলিয়ে দেবে, তখন ওই পৃষ্ঠপোষণাই বিজ্ঞানচর্চাকারীদের বাঁচায়। তবে ওই পৃষ্ঠপোষণা চিরদিন স্থায়ী হয়নি, বলাই বাহুল্য।

ইসলামে জ্ঞানবিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ বলতে মূলত আব্বাসি যুগের কথা বলা হয়। আব্বাসি সাম্রাজ্যের পত্তন করেন আল আব্বাস। তিনি আব্বাসি সাম্রাজ্যকে সংহত করার কাজ শুরু করেন। সাম্রাজ্যের রাজপুরুষদের পদে তিনি আরব ছাড়াও অন্যদের আনতে শুরু করেন— পারসি, খ্রিস্টান ও ইহুদিরা সাম্রাজ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ পান। তাঁর পরে খলিফা হন আল মনসুর। আল মনসুর নতুন রাজধানী স্থাপন করেন বাগদাদে। অষ্টম শতকে টাইগ্রিস নদীর পশ্চিম পাড়ে স্থাপন করা হয় বিশাল ওই শহরটি। সেখানে খলিফার প্রাসাদ। তাকে ঘিরে বাকি শহর তৈরি হওয়ার ৫০ বছর পরেই সে-শহর শুধু বিশ্বের বৃহত্তম শহরই হয়ে ওঠেনি, হয়ে ওঠে শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র। এর আগে কাছের আরও দুটি বড়ো শহর, কুফা আর বসরা পত্তন করেছিলেন খলিফারা। বাগদাদ শহর স্থাপন করার জন্য জায়গা পছন্দ করেন আল-মনসুর নিজে। আর কবে সে-শহর স্থাপন করা হবে, তা স্থির করার জন্য তিনি তিনজন জ্যোতিষীর পরামর্শ নেন। ভারত থেকে শুরু করে পারসি, ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য হয়ে ইসলামি সাম্রাজ্যেও জ্যোতিষচর্চা চলত পুরোমাত্রায়। ইসলামে অবশ্য জ্যোতিষচর্চা নিষিদ্ধ। তবু জ্যোতিষচর্চা কিন্তু বন্ধ হয়নি।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে মুসলমান মনীষীদের অবদান অবিস্মরণীয়। যুগ যুগ ধরে গবেষণা ও সৃষ্টিশীল কাজে তাঁদের একাগ্রতা প্রমাণিত। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা সভ্যতার বিকাশকে করেছে আরও গতিশীল। রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস সর্বত্র ছিল তাঁদের অগ্রণী পদচারণা। বহু মুসলমান বিজ্ঞানী দিগন্ত উন্মোচনকারী আবিষ্কার করে গোটা বিশ্বের চেহারাই বদলে দিয়েছেন। সেসব আবিষ্কার ও গবেষণার আধুনিকীকরণ ঘটেছে, তার সুফল ভোগ করছে আজকের বিশ্ববাসী।

২

৭৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৯০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেড়শো বছর আরবদের বিশেষ গৌরব ও প্রতিপত্তির যুগ। সপ্তম আব্বাসি খলিফা আল মামুনের সময় তাঁরা জ্ঞানচর্চার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিলেন। কর্ডোভা, বাগদাদ এবং কায়রোতে দুনিয়ার সব দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা যেতেন। ইউরোপ থেকেও শিক্ষার্থীরা যেতেন মুসলমান আলেমদের কাছ থেকে জ্ঞান অধ্যয়ন করতে। সুলতান মামুদ এবং তাঁর পরবর্তী গজনির শাসকদের কাছে বিদ্যার যথেষ্ট সমাদর ছিল। সেলজুক শাসকরাও পিছিয়ে ছিলেন না। সেই সময় এক লাইব্রেরিতে দুই লাখ থেকে ছয় লাখ করে বই থাকত। সেটা সত্যিই বিস্ময়কর, কারণ, তখন সব বই তৈরি হত হাতে লিখে।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ১৯৩২ সালে সভাপতির অভিভাষণে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় ইসলামের কীর্তি বিষয়ে দীর্ঘ ভাষণ শেষ করেন এইভাবে, "আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই ... কিন্তু জ্ঞানরাজ্যে ইসলামের কীর্তিমালার বর্ণনার জন্য ইহা যথেষ্ট নহে।

বাগদাদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় যতটা ক্ষতি হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছে সেখানকার অমূল্য ও অসংখ্য পুস্তাকাদি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায়। চেঙ্গিস ও হালাকুর সৈন্যরা বিশ্বসংস্কৃতির যে-ক্ষতি করেছে, তার একমাত্র তুলনা জুলিয়াস সিজারের আক্রমণে আলেক্সান্দ্রিয়া লাইব্রেরির ধ্বংসসাধন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চেঙ্গিসের বংশধররা ইসলাম গ্রহণ করার পরেই তাঁদের স্বভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটে। ধ্বংসকারীরা তখন নির্মাণকারী। শিক্ষার পরম শত্রুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন। হালাকুর বংশধররা তাঁদের পূর্বপুরুষ-কৃত অনিষ্টের ক্ষতিপূরণ করবার জন্য তাঁদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যা তাঁরা ধ্বংস করেছেন, তা তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

মোঙ্গলবংশের সুলতান খোদাবান্দা বিদ্যা এবং বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কুবলাই খান চীন দেশে আরবের জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচার করেছিলেন। তৈমুর লঙ সাহিত্য আর বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি রাজ্যশাসন বিষয়ে বই লিখেছিলেন। তাঁর বিপুল সাম্রাজ্যের সর্বত্র তিনি বড়ো বড়ো কলেজ, পাঠাগার ও মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তৈমুরের পত্নী বিবি খানুম একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজটি তাঁর নামে পরিচিত ছিল।

আরবরা যে-গতিতে রোমান সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলো দখল করেছিলেন, সেই বেগে বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছিলেন। মহম্মদের মৃত্যুর একশো বছরের মধ্যে গ্রিক দার্শনিক গ্রন্থগুলো আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ইলিয়াড ও ওডিসি-র মতো মহাকাব্যে দেবদেবীর আখ্যান থাকায়, সেই কারণে তা ইসলামবিরোধী হওয়ায়, গ্রন্থদুটো আরবিতে অনুবাদ করা যায়নি। তবে আরবের বিদ্বৎসমাজ ওই মহাগ্রন্থ পড়ার জন্য সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। আব্বাসি যুগে সংকলিত হাদিস গ্রন্থগুলো

আজও মুসলমানসমাজের পথপ্রদর্শক। এর মধ্যে বুখারি এবং মুসলিমের সহি হাদিসগুলি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। সত্যানুসন্ধানের জন্য তাঁরা যে-পরিশ্রম করেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। বুখারি ছয় লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেছিলেন। তার মধ্যে থেকে শুদ্ধ হাদিস হিসেবে ৭২৭৫-টি বেছে নেন এবং বাকিগুলো যে অশুদ্ধ, সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে সেগুলো বাতিল করেন। এর জন্য তিনি টানা ১৬ বছর কাজ করেছেন।

ইমাম গজ্জালিকে ইসলামের যুক্তি (হুজ্জাতুল ইসলাম) নামে অভিহিত করা হয়। গজ্জালির অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল 'আহইয়া উল উলুম অদ্দিন' বা 'সঞ্জীবনী ধর্মবিজ্ঞান', 'মুরকিদ মিনাদ দালাল' বা 'ভ্রমত্রাতা', ফারসি 'কিমিয়ায়ে সাআদাত' বা 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি', 'তাহাফুতুল ফলসিফা' বা 'দর্শনের ভ্রমমণ্ডল', 'ইয়াকুতোৎ তাবিল' কোরান শরিফের ভাষ্য। তিনি প্রায় ৪০০-টি বই লিখেছিলেন। আবুল ফারাজের 'কিতাবুল আগানি' একটি বিস্ময়কর গ্রন্থ। এটি মূলত সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ। এতে শতাধিক সুর এবং বহু গান সংকলিত হয়েছে, তার সঙ্গে আরবের কবি এবং গায়কদের জীবনীও রয়েছে। একে আরবের সংগীত বিষয়ক আদি গ্রন্থ বলা যেতে পারে।

তাবারি ছিলেন ইতিহাসকার। তাঁর ইতিহাস ও তফসির জগদ্‌বিখ্যাত। পৃথিবীর জন্মকাল থেকে ৯১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস লিখেছিলেন তিনি। বইটি এতই প্রকাণ্ড যে, সেটি নিয়ে তাঁর ছাত্ররা খুবই অসুবিধেয় পড়তেন। তিনি তাই ওই বইয়ের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করেন। তাঁর ওই বৃহৎ সংস্করণটি কেউ পড়ল না দেখে তিনি দুঃখ করে লিখেছিলেন, "এখন আর লোকের বিদ্যার জন্য আগ্রহ নাই।" ঐতিহাসিক মাসউদিকে আরব জাতির হেরোডোটাস বলে সম্মানিত করা হয়। কুতাইবা নামে এক ইতিহাসলেখকও বর্ণনক্ষমতা, সত্যনিষ্ঠা এবং অনুসন্ধিৎসার জন্য সভ্য জগতে সমাদর লাভ করেছিলেন। ইবনুল আসিফ আর-একজন বিখ্যাত ইতিহাসপ্রণেতা।

ভ্রামণিকদের মধ্যে প্রথমেই আল বিরুনির নাম করতে হয়। তিনি ভারতে এসে বহুদিন হিন্দুদের মধ্যে বাস করেছিলেন এবং তাদের ভাষা, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, আচার ব্যবহার, আইন, প্রাকৃতিক অবস্থা আয়ত্ত করে তাঁর বইয়ে লিখেছিলেন। ভূগোল-লেখকদের মধ্যে ইয়াকুত, ইদ্রিসি, মুকাদ্দাসি, হামাদানি প্রভৃতির নাম বিখ্যাত। আরবরা দিক্‌নির্ণায়ক যন্ত্রও প্রস্তুত করেছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য তাঁরা সেই যন্ত্রের সাহায্য নিতেন। আফ্রিকার নানা জায়গায়, ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে, ভারতের উপকূলে এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জে আরবরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

দার্শনিকদের মধ্যে কিন্দির নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। তাঁকে 'ফায়লাসুফুল আরব' বলে অভিহিত করা হত। 'আরবের দার্শনিক' বলতে কিন্দিকে বোঝাত। আর-একজন দার্শনিক আল ফারাবি অ্যারিস্টটলের দর্শন সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। ইবন সিনা বিশ্ববিশ্রুত। তিনি শুধু দার্শনিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন না, চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর অগাধ বুৎপত্তি ছিল। গ্রিক, পারসি এবং আরব দর্শনের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। ইউরোপীয়দের

আরবরা যে-গতিতে রোমান সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলো দখল করেছিলেন, সেই বেগে বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছিলেন। মহম্মদের মৃত্যুর একশো বছরের মধ্যে গ্রিক দার্শনিক গ্রন্থগুলো আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

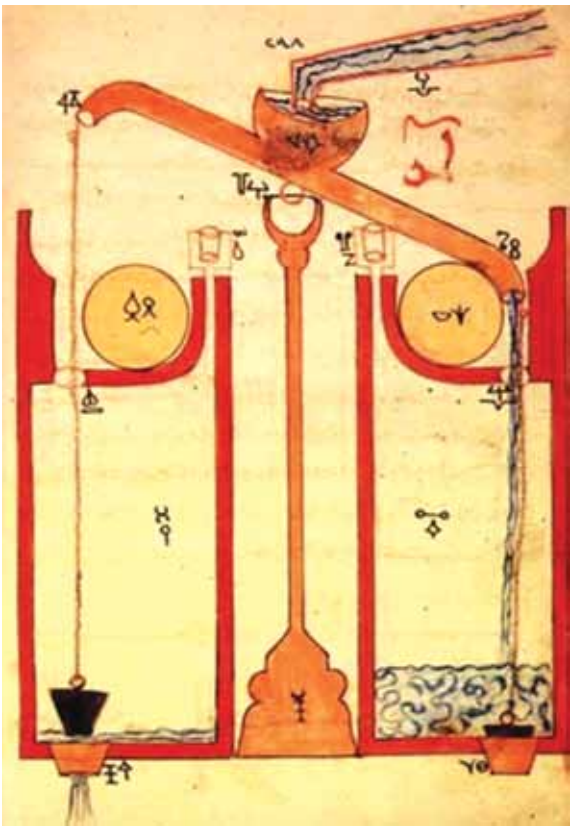

কাছে ইবন রুশদ মুসলমান দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ স্থান অধিকার করে আছেন।

ঔষধবিজ্ঞান এবং শল্যচিকিৎসাতেও আরবরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। গ্রিক চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁরা প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। এখন যাকে ডিসপেনসারি বলা হয়, তার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা আরবরা। আবুল কায়েস নামে এক চিকিৎসককে আধুনিক অস্ত্রোপচারবিদ্যার ভিত্তিমূল বলা যেতে পারে। মেয়েদের অস্ত্রচিকিৎসার জন্য স্ত্রী-চিকিৎসক তৈরি করা হত। বাগদাদ কায়রো প্রভৃতি শহরের হাসপাতালগুলোর ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে এখনকার ইউরোপীয় হাসপাতালের সমতুল্য ছিল। উদ্ভিদবিদ্যার শিক্ষা ও অনুশীলনের জন্য কর্ডোভা, বাগদাদ, কায়রো এবং ফেজে বাগান তৈরি করা হয়েছিল এবং ওই বাগানে অধ্যাপকরা বক্তৃতা করতেন। মুর শাসকরা স্পেনে নানা রকমের নতুন ফল ও শস্যের আমদানি করেছিলেন। আরবরা জিয়োলজি বা ভূতত্ত্বেরও আলোচনা করতেন। খোলাফায়ে রাশেদুনের সময় ধর্মের প্রাধান্য ছিল বেশি, উমাইয়ারা জোর দেন শক্তির ওপর। আব্বাসিদের আমলে জ্ঞানচর্চার প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে উমাইয়া সাম্রাজ্যের এবং প্রাচীন এথিনীয়দের সঙ্গে আব্বাসিদের তুলনা করা যেতে পারে।

এ-বইয়ে প্রসঙ্গগুলো আলোচনা হয়েছে নিবিড় শ্রদ্ধায় এবং যত্নে। আমাদের ইতিহাস বা বিজ্ঞান পাঠের কোনো পর্বে ইসলামি বিজ্ঞান বা উদ্ভাবন নিয়ে কোনো আলোচনার কখনো ঠাঁই হয়নি। কিন্তু মুসলমানরাও কি তেমন করে ইসলামের ইতিহাসের এই আলোকোজ্জ্বল পর্বটা জানা বা জানানোর চেষ্টা করেছেন? মুসলমানের এহেন একটা আলোকিত পরম্পরা কেন আজ 'ইসলামোফোবিয়া'র মোকাবিলায় প্রচার প্রায় না, তার জবাব কিন্তু মুসলমানকেই দিতে হবে।

মিলন দত্ত

তারায় তারায়

ব্রহ্মহৃদয়

শীতকালের রাতে উত্তর দিকের আকাশে চোখ রাখলে তিনটি খুব উজ্জ্বল তারা আমাদের চোখে পড়বে— অভিজিৎ, স্বাতী ও ব্রহ্মহৃদয়। ব্রহ্মহৃদয় তারাটি রাতের আকাশের ষষ্ঠ উজ্জ্বল তারা। এর ল্যাটিন নাম কাপেলা বা আলফা অরিগাই বা আলফা অর। ল্যাটিন ভাষায় কাপেলা শব্দের মানে ছাগলছানা। কাপেলা বা ব্রহ্মহৃদয়কে ছাগলছানারূপে কল্পনা করার নজির খুব প্রাচীন। গ্রিক-পুরাণের কাহিনিতে আমরা পাই, ক্রোনোস নামে এক দেবতা ছিলেন। যাঁকে সময়ের দেবতা বলা হত। তাঁর স্বভাব ছিল খুব নিষ্ঠুর। নিজের সন্তানরা যাতে ভবিষ্যতে কখনো তাঁকে সরিয়ে রাজা না হতে পারে তাই তাদের জন্মাবার পর তিনি একের পর এক সন্তানকে খেয়ে ফেলতেন। তাই ক্রোনোসের স্ত্রী রিহা (Rhea) জিউস নামের শিশুপুত্রটি জন্মাবার পর তাকে একটি পাহাড়ের গুহায় রেখে আসেন, যাতে অন্তত এই সন্তানটি প্রাণে বাঁচে। এবং ক্রোনোসকে একটি কাপড়ে জড়ানো পাথরকে শিশুপুত্র জিউস বলে এগিয়ে দেন। ক্রোনোস সেটিকে খেয়ে ফেলেন। জিউস পাহাড়ের গুহায় অমালথিয়া নামের একটি ছাগলের দুধ খেয়ে বড়ো হতে থাকেন। পরবর্তীকালে বড়ো হয়ে তিনি দেবতাদের রাজা হন এবং অত্যাচারী পিতাকে হত্যা করেন। প্রাচীন গ্রিকরা মনে করতেন, কাপেলা তারাটি আসলে তাদের পুরাণকাহিনির ওই ছাগলটি।

ব্রহ্মহৃদয় বা কাপেলা তারাটি সূর্য থেকে খুব বেশি দূরে নয়, এককথায় আমাদের পড়শি বলা চলে। আলোর বেগে চললে এই তারায় পৌঁছোতে ৪২ বছর লাগবে। ৪২ বছর শুনতে খুব বেশি মনে হলেও, শুনলে অবাক হতে হয়, এমন অনেক তারা আছে, যাদের কাছে পৌঁছোতে লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যাবে। কাপেলাকে যদিও আকাশে একটি মাত্র তারা হিসেবে দেখা যায়, এটি আসলে চারটি তারা দিয়ে তৈরি তারাপুঞ্জ। এই চারটি তারা আবার একসাথে থাকে না। দুটো তারা জোড় বেঁধে একটি বাইনারি স্টার সিস্টেম তৈরি করেছে। যে-চারটি তারা নিয়ে কাপেলা তারাপুঞ্জ তৈরি, তারা হল— Capella Aa, Capella Ab, Capella H, Capella L। Capella Aa ও Capella Ab মিলে তৈরি করেছে একটি বাইনারি স্টার সিস্টেম। Capella H ও Capella L মিলে তৈরি করেছে অপর বাইনারি স্টার সিস্টেম। বাইনারি স্টার সিস্টেমে দুটি তারা একে অপরকে নিজের ভরকেন্দ্রে রেখে দু-জন দু-জনের চারপাশে ঘুরতে থাকে।

Capella Aa ও Capella Ab তাদের ভিতরকার হাইড্রোজেনকে ব্যবহার করতে করতে প্রায় ফুরিয়ে ফেলেছে। এবং ক্রমে ঠান্ডা হতে হতে হলুদ দানব তারায় পরিণত হয়েছে। দুটি তারাই সূর্যের চেয়ে প্রায় আড়াই গুণ বড়ো। সূর্যের থেকে আকারে বড়ো তারারা তাদের ভেতরের জ্বালানি খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে ফেলে এবং এদের আয়ু কম হয়। এই তারাগুলি যত জ্বালানি ফুরিয়ে ফেলে তত ঠান্ডা হতে থাকে এবং প্রসারিত হতে থাকে। একেবারে শেষ অবস্থায় এই তারারা লাল দানব তারায় পরিণত হয়। Capella Aa ও Capella Ab-র এখনও লাল দানবে পরিণত হতে অনেক সময় বাকি।

Capella Aa ও Capella Ab-র ব্যাস সূর্যের প্রায় ১০ গুণ। Capella Aa-এর আলো বিকিরণের পরিমাণ সূর্যের ৮০ গুণ ও Capella Ab-এর ৫০ গুণ। তাই বোঝা যাচ্ছে, Capella যথেষ্ট উজ্জ্বল তারা। কাপেলা বা ব্রহ্মহৃদয় আজ থেকে ২ লক্ষ ১০ হাজার বছর থেকে ১ লক্ষ ৬০ হাজার বছর— এই ৫০ হাজার বছরের সময়সীমার মধ্যে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম তারা ছিল। এই সময়ের আগে আকাশের উজ্জ্বলতম তারা ছিল রোহিণী। কাপেলা তারাপুঞ্জের অপর বাইনারি জোড় তারা Capella H ও Capella L লাল বামন শ্রেণির তারা।

মহাকাশে তারারা নিজেদের শরীর থেকে ছড়িয়ে দেয় বিভিন্ন মহাজাগতিক রশ্মি। বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন ব্রহ্মহৃদয় নিজের শরীর

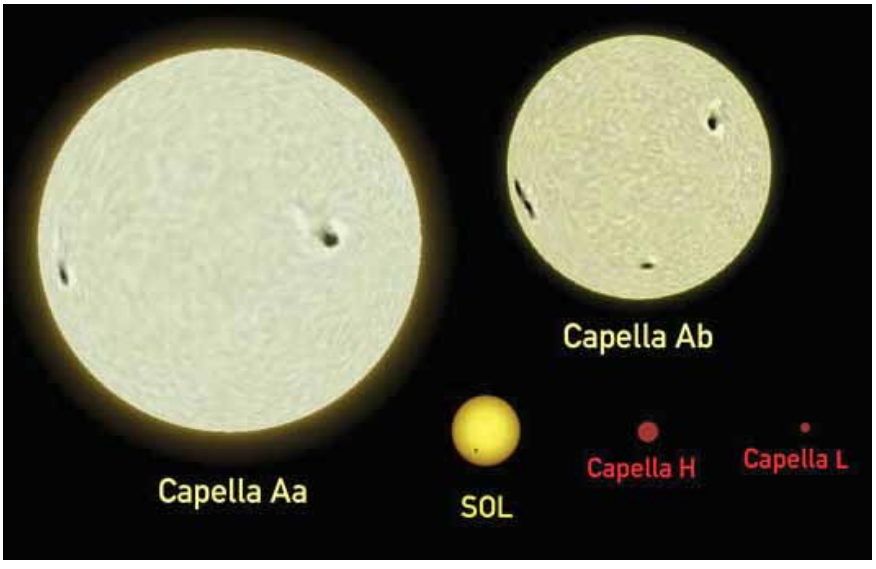

থেকে ক্রমাগত ছড়িয়ে দিচ্ছে ড-রশ্মি।

বিভিন্ন দেশের পুরাণে সংস্কৃতিতে কাপেলার উল্লেখ আছে। আছে নানা উপকথায়। টলেমির 'আলগাস্টে' নামের বইতে বলা হয়েছে, আকাশে কাপেলাকে কল্পনা করা হয়েছে একজন রথচালক যোদ্ধার বাম কাঁধ হিসেবে। গ্রিক-পুরাণে কল্পনা করা হয়েছে জিউসকে প্রতিপালনকারী ছাগল হিসেবে। মধ্যযুগের বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞান-সংক্রান্ত লেখালেখিতে এই তারাটিকে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কখনো আলথাইয়োট, কখনো আলহাতদ, আলানাক, আলানত বিভিন্ন নামে। পণ্ডিতদের ধারণা তারাটির আরবি ভাষায় নাম ছিল আইয়ুক। যা লোকের মুখে মুখে বিকৃত হয়ে বিভিন্ন রূপ পেয়েছে। যদিও আইয়ুক শব্দের আরবি ভাষায় নির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেই। অনেকে বলেন, এটির মূল উৎস গ্রিক শব্দ আইক্স (Aiks), যার অর্থ ছাগলী। আরবি ভাষায় কাপেলার আরেকটি নাম আল-রাকিব, যার অর্থ চালক।

প্রাচীন সময়ে বাল্টিক প্রদেশের লোকেরা এই তারাকে ডাকত পেরকুনো ওজকা, অর্থাৎ ঝড়ের দেবতার ছাগল। ম্যাসিডোনিয়ার লোকগীতিতে আবার একে জাসত্রেব নামে একটি বাজপাখি হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্রমতে কাপেলা সাধারণ মানুষ ও সৈন্যদের ভাগ্য ও সম্মান বৃদ্ধি করত বলা হয়েছে। গ্রিক-পুরাণে পাই জিউস তাঁর পালিকা আমালথিয়া ছাগলটির শিং অসাবধানতাবশত ভেঙে ফেলেন। তাই তিনি ঘোষণা করেন এই শিংটির এমন ক্ষমতা হবে, কোনো ব্যক্তি যদি কিছু চান তাহলে শিংটিতে

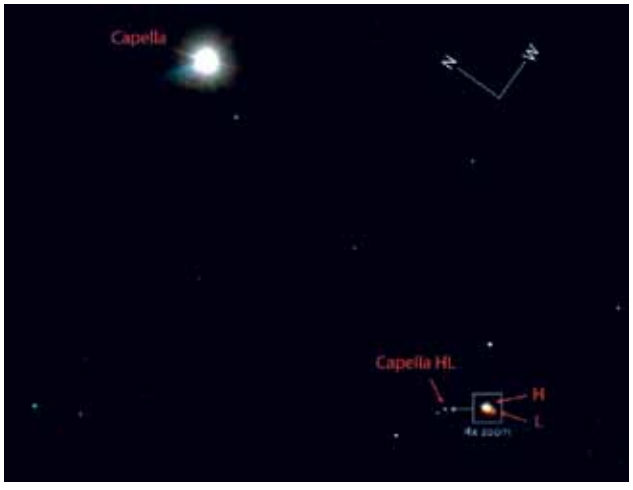

তা ভর্তি হয়ে যাবে। এটিও সৌভাগ্য আর প্রাচুর্যের গল্প। হিন্দু-পুরাণে এই তারার নাম ব্রহ্মহৃদয়। চীনারা আকাশে পাঁচটি তারাকে রথ হিসেবে কল্পনা করেন, তার মধ্যে এই তারাকে চীনারা দ্বিতীয় রথ বলেন। চীনা ভাষায় এর নাম উত্তচের।

পেরুর কুয়েচুয়াতে ব্রহ্মহৃদয়কে ডাকা হত কোলকা বলে। ইনকা সভ্যতায় এই তারার খুব গুরুত্ব ছিল। তাহিতির লোকগীতি অনুযায়ী কাপেলা হল ফা-নুই-এর স্ত্রী। নাম তাহি-আরি। তাহি-আরি আবার রাজপুত্র তায়োরুয়া-এর মা। তায়োরুয়া আর-কেউ নয় শনি গ্রহ। তায়োরুয়া সারাআকাশে ডিঙিনৌকো বায়— তাহিতি দ্বীপের মানুষজনের এরকমই বিশ্বাস।

অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া প্রদেশের আদিম জনজাতি বুরুং-রা মনে করতেন কাপেলা তারাটি আসলে পুরা নামে একটি ক্যাঙারু ছিল, যাকে ক্যাস্টর ও পোলাক্স দুই তারা, যাদের যমজ ভাই বলে মনে করা হয়, হত্যা করেছিল।

অতনুমিথুন মণ্ডল

দেশ

সেনেগাল

২০০২ সালে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে ফুটবলপ্রেমী বাঙালির কাছে ধরা দিল নতুন একটি দেশ, যারা প্রথম বিশ্বকাপের মঞ্চে নেমে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল গতবারের চ্যাম্পিয়ান হট ফেভারিট ফরাসিদের। একইসঙ্গে যেন বদলা নিল, বহু বছর ধরে ফরাসিদের কাছে পরাধিনতার, দেশটির নাম সেনেগাল। রাত জেগে চ্যাম্পিয়ান্স লিগ, উয়েফা লিগ দেখা বাঙালির চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছেন এই দেশেরই ফুটবলার সাদিও মানে। যাঁকে এ-মুহূর্তের অন্যতম ফুটবল সেনসেশন বলা হচ্ছে। তাই দেখতে পাচ্ছি সেনেগাল আমাদের কাছে খুব অপরিচিত নাম নয়। কিন্তু ভালো ফুটবল খেলে, এর বাইরে কতটুকু দেশটাকে জানি? দেখা যাক, কেমন এই দেশটি?

পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটি প্রায় ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭১২ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে রয়েছে। জনসংখ্যা ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩২৩ জন। অর্থাৎ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। সেনেগালের উত্তর দিকে রয়েছে মাওরিতানিয়া, পূর্বে মালি, দক্ষিণ-পূর্বে গিনি ও দক্ষিণ-পশ্চিমে গিনি-বাসাও। দেশের উত্তর ও দক্ষিণ

প্রান্তের মধ্যে সবু এক ফালির মতো অন্য একটি দেশ রয়েছে— দেশটির নাম জাম্বিয়া। জাম্বিয়া সেনেগালের যে-অংশকে দেশটির অন্য অংশ থেকে আলাদা করেছে তার নাম কাসামানস।

পণ্ডিতদের মত অনুযায়ী পর্তুগিজরা বাণিজ্য করতে এসে এই দেশকে ডাকত জেনেগা বা মালহাজা বলে। যা পরে লোকের মুখে মুখে পরিবর্তিত হয়ে সেনেগাল হয়ে গেছে। আবার কারো কারো মতে এ-দেশের প্রাচীন ধর্মের প্রধান দেবতা 'রোগ সেনে' (Rog Sene) এবং 'ও গাল' (O Gal)– এই দুই শব্দের মিশ্রণে সেনেগাল নামটি এসেছে। 'ও গাল' শব্দটির অর্থ জলের শরীর। আবার ভিন্নমতও আছে— এ দেশের প্রাচীন উলুফ ভাষার শব্দ 'সুন্নু গাল' (Sunnu Gal) থেকে সেনেগাল নাম হয়েছে। 'সন্নু গাল' কথাটির অর্থ আমার নৌকো।

পুরাতাত্ত্বিক খননকার্য ও অনান্য পরীক্ষানিরীক্ষায় দেখা গেছে সেনেগালে বহু পুরোনো সময় থেকেই বিভিন্ন জাতি-উপজাতি বসবাস করছে। সপ্তম শতাব্দীতে কিছু সাম্রাজ্যের হদিশ পাওয়া যায়। নবম শতাব্দীতে ছিল তারকুর ও নামানদিরু সাম্রাজ্যের রাজত্ব। জোলোফ সম্রাটরা রাজত্ব করতেন তেরো ও চোদ্দো শতাব্দীতে। এগারো শতাব্দীর আগে পর্যন্ত সেনেগালের লোকজন দেশীয় নানান ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করত। এই সময়ের পরে তোওকোলুত্তর ও সোনিনকে জনজাতির মানুষদের মধ্যে দিয়ে সেনেগালের মানুষজন ইসলাম ধর্মকে জানে, গ্রহণ করে ও পালন করতে শুরু করে। চোদ্দো শতাব্দীতে জোলোফ সাম্রাজ্য আকারে বেশ বড়ো হয়। পশ্চিম আফ্রিকার বিশাল অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

পনোরো শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেনেগালের সমুদ্রতীরে দেখা গেল বিদেশিদের। পর্তুগিজরা তাদের জাহাজ ভেড়াল। তাদের পিছু-পিছু এল ডাচ, ফরাসি, ইংরেজ। বাণিজ্যের দখল নিয়ে তাদের মধ্যে ঝামেলা যুদ্ধ লেগেই থাকতে লাগল। ১৬৭৭ সালে শেষমেষ ফরাসিরা সেনেগালের দখল পেল। ফরাসিরা প্রথম দখল নিল গোরি দ্বীপ। এটি ছিল আটলান্টিক মহাসাগরের কুখ্যাত দাস-ব্যাবসার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে আমেরিকায় প্রচুর দাস পাচার হত এই সময়। যদিও ফরাসিরা ধীরে ধীরে দাস-প্রথা তুলে দিতে থাকে এবং ১৮৫০ সাল অবধি সেনেগালে তাদের সাম্রাজ্য বাড়াতে থাকে। ১৯৬০ সালে সেনেগাল শান্তিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা লাভ করে।

ভৌগোলিকরা তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীকে বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করেছেন। সেনেগালের জলবায়ুকে সহেলীয় জলবায়ু বলা হয়। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর দিকের বিস্তীর্ণ অংশে এই জলবায়ু দেখা যায়। আরবি ভাষায় সহেল শব্দের অর্থ সমুদ্রতীর। সহেলীয় জলবায়ু অঞ্চলে গরম খুব বেশি পড়ে। সারাবছর ধরে শুকনো বাতাস বয়, যদিও বৃষ্টিপাতও পর্যাপ্ত হয়। সেনেগালে প্রচুর বালিয়াড়ি দেখা যায়, যা তীব্র বাতাসের ঝাপটায় জায়গা পরিবর্তন করে। এই ধরনের বালিয়াড়িকে চলমান বালিয়াড়ি বলে।

সেনেগালের আবহাওয়া একটু রুখাশুখা হলেও চাষবাস খারাপ হয় না। আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলির মতো এ-দেশও চাষের ওপর যথেষ্ট নির্ভর করে। চীনেবাদাম, আখ, তুলো, টমেটো, আম প্রধান ফসল। খনিজ সম্পদেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ সেনেগাল। খনি থেকে ফসফেট তোলা, পেট্রোলিয়াম শোধন, জাহাজ তৈরি ও মেরামতি এ-দেশের প্রধান কিছু শিল্প। সেনেগালে বিভিন্ন জনজাতি, ভাষাভাষীর মানুষ বাস করে। তাই এ-দেশে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রয়েছে। উলুক জনজাতির মানুষরা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। সমস্ত জনসংখ্যার প্রায় ৪৩ ভাগ মানুষ এই উলুক জনজাতির। এ ছাড়া ফুলা, তোওকুওলের, সেরের, জোলা, সোসিনকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে।

দীর্ঘকাল ফরাসি শাসনে থাকা সেনেগালের অফিসিয়াল ভাষা ফরাসি। অফিসিয়াল ভাষা বলতে বোঝায় কোনো দেশের ব্যাবসা, বাণিজ্য, অফিস, বিভিন্ন সরকারি কর্মকাণ্ড কোন ভাষার মাধ্যমে চলে। যদিও এ-দেশের মাত্র ২১ শতাংশ মানুষ ফরাসি ভাষা ভালোভাবে শিখেছেন। তাই দেশের বেশিরভাগ মানুষই নিজের নিজের জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় কথা বলেন। যেমন রাজধানী ডাকারে যোগাযোগের ভাষা উলুফ। ফুলাস ও তোওকুওলের উপজাতির মানুষ পুলার ভাষায় কথা বলেন। সেরের উপজাতির লোকেরা বলেন সেরের ভাষা,

দেশের সংবিধান অনুযায়ী সেনেগাল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। যদিও দেশের ৯৫ ভাগ মানুষ সুন্নি মুসলমান, ৪ ভাগ মানুষ খ্রিস্টান। খ্রিস্টানদের বেশিরভাগই ক্যাথলিক খ্রিস্টান। দক্ষিণ এশিয়ার প্রচুর মানুষ কাজের সূত্রে সেনেগালে থাকেন।

কাসামানসের লোকেরা বলেন জোলা ভাষা। এক কথায় নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান।

দেশের সংবিধান অনুযায়ী সেনেগাল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। যদিও দেশের ৯৫ ভাগ মানুষ সুন্নি মুসলমান, ৪ ভাগ মানুষ খ্রিস্টান। খ্রিস্টানদের বেশিরভাগই ক্যাথলিক খ্রিস্টান। দক্ষিণ এশিয়ার প্রচুর মানুষ কাজের সূত্রে সেনেগালে থাকেন। সেনেগালে স্বল্প সংখ্যক হিন্দু ও বাহাই ধর্মবিশ্বাসী মানুষও আছেন।

আফ্রিকার বিশাল সংখ্যক দেশ অপুষ্টি, মহামারি ও বিভিন্ন মারণ অসুখের কবলে পড়ে প্রায় কোনোভাবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। কিন্তু সেনেগাল সে-দিক থেকে ব্যতিক্রমী। ২০১৬ সালের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী সেনেগালের মানুষের গড়-আয়ু প্রায় ৬৭ বছর। ১৯৫০ সালে ১০০০ জন শিশু জন্মালে যেখানে মারা যেত ১৫৭ জন শিশু, এখন সেই সংখ্যা ৩২।

সেনেগালের সংস্কৃতি বেশ সমৃদ্ধ। পশ্চিম আফ্রিকার রীতি অনুযায়ী

এখানেও গল্প বলার রীতি চালু আছে। এই গল্পবলিয়েদের বলে গ্রিয়োটস। তাঁরা কথা ও গানের মধ্যে দিয়ে হাজার হাজার বছরের পূর্বপুরুষের সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছেন। সেরের উপজাতিদের বানানো ঢাক পৃথিবীবিখ্যাত। উলুফ ভাষার মানুষরা নিজেদের পরিচয় দেন তেরাঙ্গা নামে, যার অর্থ আতিথেয়তা। সেনেগাল জাতীয় ফুটবল দলের নামও Lions of Teranga।

গৃহযুদ্ধ, দারিদ্র্য, অপরাধ-প্রবণতা সামগ্রিকভাবে এক পিছিয়ে পড়া মহাদেশের মধ্যে সেনেগাল যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি। এই দেশের যথেষ্ট শান্তিপূর্ণ পরিবেশের জন্য সারাবছরই পর্যটক আসেন। সেনেগালবাসীরাও আতিথেয়তা পরম ধর্ম মেনে সমগ্র বিশ্বকে আলিঙ্গনের অঙ্গীকারবদ্ধ।

অতনুমিথুন মণ্ডল

সবজান্তা

মে ক থা

মে মাসের ৭ তারিখ (১৮১২ সাল) বিখ্যাত ইংরেজ কবি ও নাট্যকার রবার্ট ব্রাউনিং (Robert Browning)-এর জন্ম। রবার্ট ব্রাউনিঙের মা ছিলেন পিয়ানোবাদক। পিতা একজন ব্যাঙ্ক-কর্মচারী। তিনি একাধারে শিল্পী, পণ্ডিত ও প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য চিত্র ও বইয়ের এক বিশাল সংগ্রহ ছিল। লাতিন, ফ্রেঞ্চ, গ্রিক, হিব্রু ও ইতালীয় ভাষায় লেখা প্রায় ছয় হাজারেরও বেশি বইয়ের এক বিশাল সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন। ব্রাউনিঙের শিক্ষার বড়ো অংশটুকুই এসেছিল পিতার কাছ থেকে। স্কুলের বাঁধাধরা নিয়মকানুন তিনি পছন্দ করতেন না। তবে ছোটোবেলা থেকেই তিনি খুব মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। ধারণা করা হয়, মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই তিনি লিখতে-পড়তে পারতেন। ভিক্টোরিয়ান যুগের এই প্রসিদ্ধ কাব্য-নাট্যকারের কবিতা বিদ্রূপ, চরিত্রায়ণ, হাস্যরস, সামাজিক ভাষ্য, ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা ইত্যাদি কারণে ছিল জনপ্রিয়। তাঁর বেশিরভাগ কাব্যে গল্পকার হিসেবে একজন বাদক বা চিত্রকরকে দেখা যায়। মূলত রূপক হিসেবে এই চরিত্রগুলো তিনি তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন।

ব্রাউনিঙের সাহিত্যজীবনের শুরুটা খুব সফল হলেও সেই সফলতা

তিনি খুব বেশিদিন ধরে রাখতে পারেননি। তাঁর লেখা প্রথম দীর্ঘ কবিতা পলিন (Pauline) দান্তে গ্রাবিয়েল রসেটির দৃষ্টি আর্কষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এর পরের কবিতা প্যারাসেলসাস (Paracelsus) ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও ডিকেন্স কর্তৃক প্রশংসিত হয়। কিন্তু ১৮৪০ সালে তাঁর দুর্বোধ্য কাব্য সরডেলো (ছদ্মত্মত্রননদ্র) তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। ১৮৪৬ সালে ব্রাউনিং বিয়ে করেন জনপ্রিয় ইংরেজ কবি এলিজাবেথ ব্যারেটকে। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি কবিতা— 'Soliloquy of the Spanish Cloister', 'Porphyria's Lover', 'Meeting at Night' ইত্যাদি।

১২ ডিসেম্বর ১৮৮৯ সালে ইতালির ভেনিসে তাঁর পুত্রের বাড়িতে রবার্ট ব্রাউনিং মারা যান। ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবের পোয়েটস কর্নারে তাঁর সমাধি রয়েছে। সেখানে তিনি শায়িত আছেন আর-এক বিখ্যাত ইংরেজ কবি লর্ড টেনিশনের পাশে।

জু ন ক থা

১৯৮৪ সালের ৩ জুন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আবু বখত মহামেদ হবিবুল্লাহ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্ম বর্ধমান জেলার বাবুনিয়া গ্রামে, ১৯১১ সালের ৩০ নভেম্বর। বাবা মৌলভি আবদুল লফিত ছিলেন বর্ধমান বিভাগের বিদ্যালয় পরিদর্শক। হবিবুল্লাহ ১৯২৬ সালে হুগলি মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করেন। হুগলি কলেজ থেকে ১৯৩১ সালে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৩ সালে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় পাস করেন। বিষয় ছিল ইতিহাস। এরপর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৬ সালে পিএইচ.ডি. করেন। গবেষণার বিষয়— ভারতে মামলুক শাসন ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা। পরে এই বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Foundation of Muslim Rule in India' দেশে-বিদেশে আজও আকরগ্রন্থ হিসেবে গণ্য হয়। যদুনাথ সরকার সম্পাদিত 'The History of Bengal'-এর দুটি অধ্যায় তাঁর লেখা। কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৩৮ সালে, আলিয়া মাদ্রাসার গ্রন্থাগারিক পদে। ১৯৩৯-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৪০ সালে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে লেকচারার পদে নিযুক্ত হন। এই পদে দীর্ঘ ১০ বছর চাকরি করার পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাকিস্তানে যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে বিভাগীয় প্রধান পদে যোগ দেন। তিনি ১৯৫০ সালে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের সেকশনাল প্রেসিডেন্ট, ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত লন্ডনের নাফিল্ড ফাউন্ডেশনের ফেলো, ১৯৭৭-১৯৭৮ অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়ান ফেলো ছিলেন। মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধে একান্ত বিশ্বাসী হিসেবে তিনি খ্যাত ছিলেন।

১৯৭১-এর যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার চাকরি থেকে বরখাস্ত করলে হবিবুল্লাহ উলফসন বৃত্তি নিয়ে লন্ডন চলে যান। বাহাত্তর সালে দেশে ফিরে ফের পুরোনো পদে যোগ দেন। ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন প্রথমে ক্যানবেরা ও পরে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর। ১৯৮০ থেকে আমৃত্যু আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস প্রফেসর। আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত হবিবুল্লাহ লেখক হিসেবেও সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। মূল গবেষণাগ্রন্থ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে,'Descriptive Catalogue of Arabic', 'Persian and Urdu Manuscripts in Dacca University Library', 'সাহিত্য-সংস্কৃতি ইতিহাস', 'আল-বেরুনীর ভারততত্ত্ব' (অনুবাদগ্রন্থ)। ভারতের 'যদুনাথ গোল্ড মেডেল' ও বাংলা একাডেমি পুরস্কারে তাঁকে ভূষিত করা হয়।

জু লা ই ক থা

১৫ জুলাই, ১৮২০ সালে শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক অক্ষয়কুমার দত্তর জন্ম। নবদ্বীপের চুপী গ্রামে। তাঁর পিতা পীতাম্বর দত্ত, মাতা দয়াময়ী দেবী। তাঁর সময়ের এক আশ্চর্য রকমের ব্যতিক্রমী মানুষ, বহু বিষয়ে অগ্রপথিক, অক্ষয়কুমারের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী এ-বছর উদ্‌যাপিত হচ্ছে নানা স্থানে।

গ্রিক, ল্যাটিন, জার্মান, ফরাসি ও হিব্রু ভাষা জানা মানুষটির বিস্তৃত জ্ঞান ছিল পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, সাধারণ বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে। আমিরউদ্দীন মুন্সির কাছে শেখেন ফারসি ও আরবি।

১৮৩৮ সালে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার সূত্রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয়। ১৮৩৯ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এ-সভার সভ্য হন। ১৮৪০ সালের ১৩ জুন কলকাতায় এ-সভার উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত পাঠশালার শিক্ষক নিযুক্ত হন। পড়াতেন ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা। এ-বিষয়ে বাংলা ভাষায় পাঠ্যগ্রন্থ না থাকায় তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য লেখেন ভূগোল (১৮৪১) ও পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬) বিষয়ক বই। ভূগোল বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক বই এবং এ-বইয়ের মাধ্যমে অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা যতিচিহ্নের প্রবর্তন করেন। পদার্থবিদ্যা পরে প্রকাশিত হলেও, এটি বাংলা ভাষায় রচিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের প্রথম গ্রন্থ।

১৮৪২ সালের জুন মাসে প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় অক্ষয়কুমার দত্ত 'বিদ্যাদর্শন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাঙালি মননে বিজ্ঞান-মনস্কতা ও বিজ্ঞান-চেতনার উদ্রেক করা ছিল

গ্রিক, ল্যাটিন, জার্মান, ফরাসি ও হিব্রু ভাষা জানা মানুষটির বিস্তৃত জ্ঞান ছিল পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, সাধারণ বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে। আমিরউদ্দীন মুন্সির কাছে শেখেন ফারসি ও আরবি।

পত্রিকাটির প্রধান উদ্দেশ্য। ১৮৪৩ সালের জুন মাসে ডেভিড হেয়ারের স্মরণসভায় রীতি ভেঙে তিনি বাংলাভাষায় বক্তৃতা করেন। বিশ্বাস করতেন শিক্ষানীতি মাতৃভাষায় প্রবর্তিত হওয়া দরকার। উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞানকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিতেন এবং এর প্রসারের জন্য নিজের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অর্ধেক দান করেন।

১৮৪৩ সালের ১৬ অগাস্ট দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অক্ষয়কুমার দত্তর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি এ-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তর চেষ্টায় পত্রিকাটিতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা প্রাধান্য পায়। ১৮৪৮ থেকে এ-পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্তর দার্শনিক রচনা 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রকাশ শুরু হয়। এ ছাড়া তিন খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর 'চারুপাঠ' গ্রন্থটি ছিল সেকালের জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক। এতে ছিল নানা জ্ঞানের ছোটো ছোটো প্রবন্ধ— সহজ কথায় ও সরল ভাষায়, যা সচিত্র ও আকর্ষণীয় রীতিতে পরিবেশিত হত। এ-গ্রন্থের পরিবেশিত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাবলির মাধ্যমেই তিনি বিজ্ঞানকে উনিশ শতকের বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করে তোলেন। বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরির ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব স্মরণীয়। পরবর্তীকালে তাঁর রচিত পরিভাষা সত্তর ভাগেরও বেশি গৃহীত ও প্রচলিত হয়।

অক্ষয়কুমার দত্তর 'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ' প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালের মার্চ মাসে। বইটি ছিল রেলওয়ে সম্পর্কে বাঙালি লেখক কর্তৃক প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। এ ছাড়া ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত ধর্মনীতি বিষয়ক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সমাজচিন্তার পরিণত রূপ।

অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেও পরে ধর্ম ব্যাপারে নিস্পৃহ হয়ে পড়েন। ১৮৫১ সালে ব্রাহ্মসমাজে একটি বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তিনি ঘোষণা করেন— বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট নয়, অখিল সংসারই আমাদের ধর্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য। তিনি বীজগণিতের সূত্রের মাধ্যমে দেখিয়ে দেন, মানুষের বাসনা পূরণে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা নিষ্প্রয়োজন।

সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃৎসমিতির প্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত নারীশিক্ষার প্রসার, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধ প্রভৃতি সমাজসংস্কারমূলক কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ঘোর বিরোধী অক্ষয়কুমার নৈতিক কারণে সরকারি চাকরি করেননি। তবে ১৮৫৫ সালে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের জন্য কলকাতায় নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুরোধে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

উদ্ভিদপ্রেমিক অক্ষয়কুমার আমেরিকা ও ইয়োরোপের বহু স্থান থেকে দুর্লভ বৃক্ষচারা সংগ্রহ করে নিজের বাসভবনে সুপরিকল্পিতভাবে একটি বাগান তৈরি করেন। বাগানের প্রত্যেকটি তরু, গুল্ম ও লতার শরীরে উদ্ভিজ্জবিদ্যাসম্মত ল্যাটিন নাম ও তার স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর বাড়িতে একটি ভূতাত্ত্বিক সংগ্রহশালাও গড়ে তোলেন। এ হেন মানুষটি পরবর্তীকালে যথাযোগ্য সমাদর পাননি। ১৮৮৬ সালের ২৭ মে তাঁর মৃত্যু হয়।

অ গা স্ট ক থা

১৮৭৭ সালের ১২ অগাস্ট বাংলার এক বিস্ময়কর প্রতিভা হরিনাথ দের জন্ম কামারহাটির আড়িয়াদহ গ্রামে। ছিলেন বহুভাষাবিদ। তিনি এশিয়া ও ইয়োরোপের বহুসংখ্যক ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বয়স ৩০ পূর্ণ হওয়ার আগেই পৃথিবীর ৩৪-টি ভাষা আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন হরিনাথ। জীবিকাসূত্রে কলকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির (বর্তমানে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার) গ্রন্থাগারিক এবং ঢাকা কলেজে ইংরেজি ভাষার অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

হরিনাথের প্রাথমিক পড়াশোনা ছত্তিশগড়ের রাইপুর হাই স্কুলে। বাবা ভূতনাথ দে ছিলেন সেখানে ব্রিটিশ সরকারের পদস্থ কর্মী। প্রাথমিক পাঠ শেষ করে কলকাতা পৌঁছোন উচ্চশিক্ষার জন্য। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজ ছিল তাঁর শিক্ষাক্ষেত্র। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৯৩ সালে হরিনাথ প্রেসিডেন্সির ছাত্র হিসেবেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল্যাটিন ও ইংরেজি ভাষায় প্রথম শ্রেণিতে সাম্মানিক স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং ওই বছরই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল্যাটিন ভাষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে সরকারি

বয়স ৩০ পূর্ণ হওয়ার আগেই পৃথিবীর ৩৪-টি ভাষা আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন হরিনাথ। জীবিকাসূত্রে কলকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির (বর্তমানে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার) গ্রন্থাগারিক এবং ঢাকা কলেজে ইংরেজি ভাষার অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

বৃত্তি পান। এরপর তিনি ইংল্যান্ড যান কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। সেখানে ক্রাইস্ট'স কলেজে ভর্তি হন। কেম্ব্রিজে পড়ার সময়েই হরিনাথ গ্রিক ভাষায় এম.এ.-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে। শিক্ষাশেষে হরিনাথ প্যারিসে যান এবং সেখানকার সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা শেখেন। এরপর হরিনাথ মিশরেও যান আরবি ভাষার উচ্চতর পাঠ নিতে। আরবি ভাষা শিক্ষা শেষ করে হরিনাথ জার্মানির মারমুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য যান এবং সেখান থেকে তিনি সংস্কৃত, তুলনামূলক ব্যাকরণ এবং আধুনিক ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯০০ সাল নাগাদ তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ক্লাসিক্যাল ট্রাইপস পরীক্ষার প্রথম ভাগ দেন এবং সেই পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। পরের বছরই তিনি মধ্যযুগীয় আধুনিক ভাষায় ট্রাইপস পরীক্ষায় ডিগ্রি অর্জন করেন। অরবিন্দ ঘোষের পর তিনিই দ্বিতীয় ভারতীয়, যিনি ট্রাইপস পরীক্ষায় পাস করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হরিনাথ দে গ্রিক ল্যাটিন ও হিব্রু ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন।

গল্পের মতো শোনাবে একটা ঘটনা, যদিও এমন কাণ্ড তিনি ঘটিয়েছেন বেশ কয়েক বার। সেবার তিনি ভ্যাটিকান সিটিতে, পোপ দশম পিউসের সামনে। পোপকে ল্যাটিন ভাষায় অভিবাদন জানান বাঙালি যুবকটি। হরিনাথের বিশুদ্ধ লাতিন উচ্চারণে স্তম্ভিত পোপ, পরামর্শ দিলেন, এবার ইতালীয়টাও শিখে ফেললে হয় তো!

পোপকে স্তম্ভিত করে দিয়ে হরিনাথ এরপর পোপের সঙ্গে সরাসরি ইতালীয়তেই কথা বলতে শুরু করেন। হরিনাথ দের কর্মকাল মাত্র ১০ বছর। এই অল্প সময়েই তিনি ভাষা নিয়ে প্রচুর কাজ করেছিলেন। হরিনাথ দের সম্পাদনায় ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'Macaulay's Essay on Milton' গ্রন্থের এক অভিনব সংস্করণ। তাঁর সম্পাদিন 'Palgrave's Golden Treasury' গ্রন্থের চমৎকার সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে। পরবর্তীকালে ইবনে বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্ত 'রেহেলা' এবং জালালুদ্দিন আবু জাফর মুহাম্মদের 'আল-ফখরি' গ্রন্থদ্বয় আরবি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তিনি আরবি ব্যাকরণ প্রণয়ন নিয়ে কাজ করেছেন। এ ছাড়া তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদনা, অনুবাদ এবং গবেষণাকর্মের মধ্যে রয়েছে ইংলিশ-পার্সিয়ান লেক্সিকন সংকলন, মূল-সহ ঋগ্‌বেদের অনেকগুলো শ্লোকের ইংরেজি ভাষান্তর, ফরাসি লেখক ঝাঁলর স্মৃতিকথা সম্পাদনা, সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'র ইংরেজি অনুবাদ, 'লঙ্কাবতার সূত্র' এবং 'নির্বাণব্যাখ্যানশাস্ত্রম্'-এর সম্পাদনা, কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর ছন্দোবদ্ধ ইংরেজি ভাষান্তর, ফারসি ভাষায় রচিত ঢাকার ইতিহাস 'তারিখ-ই-নুসরাত জঙ্গি' সম্পাদনা করেছেন। বাংলায় রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' এবং অমৃতলাল বসুর 'বাবু'র ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। এ ছাড়াও তিনি ফারসি ভাষায় রচিত বাদশাহ শাহ আলমের জীবনী 'শাহ আলম নামা' সম্পাদনা করেছেন। তিনি গ্রিক, আরবি, ফারসি, পালি, বাংলা, ইতালীয়, রুশ প্রভৃতি ভাষার কবিতার ছন্দোবদ্ধ ইংরেজি অনুবাদও সম্পাদনা করেছেন। তাঁর রচিত, অনূদিত এবং সম্পাদিত গ্রন্থাবলি ৮৮ খণ্ডে সংরক্ষিত আছে জাতীয় গ্রন্থাগারে। দুর্লভ এই প্রতিভাধর মানুষটির মৃত্যু হয় অকালে, মাত্র ৩৪ বছর বয়সে। দিনটি ছিল ৩০ অগাস্ট ১৯১১।

সে প্টে ম্ব র ক থা

১৭৯১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। ইংল্যান্ডে নিউইংটন বাটস অঞ্চলে কামার পরিবারে একটি শিশুর জন্ম হল। নাম রাখা হল মাইকেল ফ্যারাডে। চার ভাই-বোনের মধ্যে ফ্যারাডে তৃতীয়।

বাবা জেমস ছিলেন একজন কামার। আর্থিক অনটনের মধ্যেই ফ্যারাডে বড়ো হতে থাকেন। বাড়ির কাছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু হয়। ফ্যারাডের উচ্চারণে সমস্যা ছিল। তিনি 'র' উচ্চারণ করতে পারতেন না। এমনকী স্কুলেও সামান্য যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ পর্যন্তই ছিল তাঁর গণিতের দৌড়। তারপর অর্থের অভাবে মাঝপথেই স্কুল ছেড়ে দিতে হয়। এরপর আর-কোনোদিন স্কুলে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর।

মাত্র ১৩ বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে কাজ নেন একটি বইয়ের দোকানে। সেখান থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করতেন। এর পর কাজ নেন বই বাঁধাইয়ের দোকানে। কাজের ফাঁকে অবসর পেলেই বসতেন বই নিয়ে। বিজ্ঞান বিষয়ক বইগুলো তাঁকে বেশি আকর্ষণ করত। কিছুদিনের মধ্যে তিনি বাড়িতে বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য ছোটো একটা ল্যাব তৈরি করে ফেলেন। হাতখরচের পয়সা বাঁচিয়ে গবেষণার জন্য একটা-দুটো করে জিনিস কিনতেন। আবার ফেলে দেওয়া আবর্জনা থেকে অনেক পুরোনো জিনিস সংরক্ষণ করতেন। ২১ বছর বয়সে একদিন হঠাৎ করে তিনি স্যার হামফ্রের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলেন। হামফ্রে তাঁকে ল্যাবরেটরির বোতল ধোয়ার কাজ দিলেন।

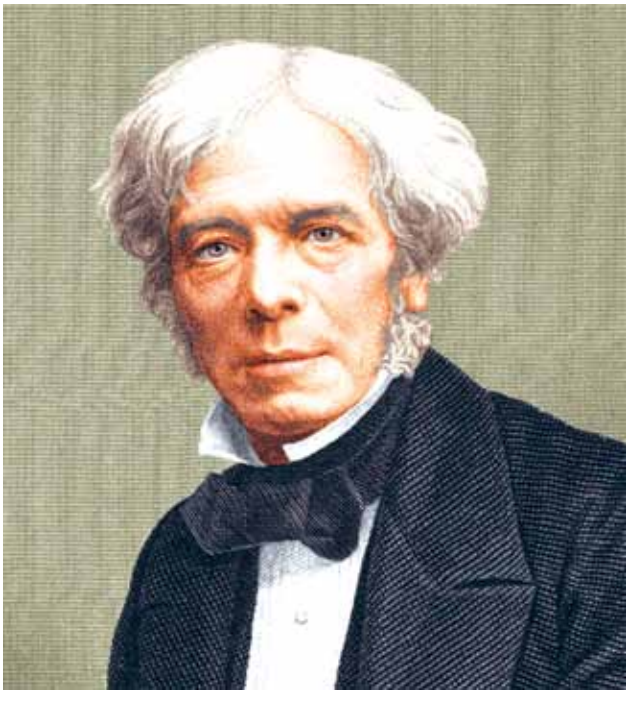

দেখা, শেখা আর নিজের প্রচেষ্টা— এই পথ ধরে তিনি মানবজাতির উন্নয়নে রাখেন মহামূল্যবান অবদান। তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে চৌম্বকের সঙ্গে তড়িতের সম্পর্ক।

কাজের ফাঁকেই তিনি হামফ্রের গবেষণা মনোযোগ সহকারে দেখতেন। দেখা, শেখা আর নিজের প্রচেষ্টা— এই পথ ধরে তিনি মানবজাতির উন্নয়নে রাখেন মহামূল্যবান অবদান।

তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে চৌম্বকের সঙ্গে তড়িতের সম্পর্ক। এর মাধ্যমেই শক্তির এক বিশাল রূপান্তর মানবজাতির হাতে আসে।

আধুনিক যুগে বিদ্যুৎ ছাড়া আমাদের এক মুহূর্তও চলা সম্ভব নয়। কিন্তু এই তড়িৎ কীভাবে, কোথা থেকে উৎপন্ন হয়? আর কাদের হাত ধরেই-বা এই অতি মূল্যবান শক্তি আমাদের সেবায় নিয়োজিত?

১৭৩৩ সালে ডাচ বিজ্ঞানী পিটার ভ্যান স্থির তড়িৎ ধরে রাখার জন্য লেডেনজার নামে এক প্রকার যন্ত্র তৈরি করেন। ১৭৪৮ সালে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (১৭০৬-১৭৯০) পিটার ভ্যানের কয়েকটা লেডেনজার সেল একত্র করে তৈরি করেন তড়িৎ-ধারক বা ব্যাটারি। তিনি এই ব্যাটারিকে চার্জ করার জন্য এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করেন। সেটাই ছিল সম্ভবত প্রথম বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্র। যাকে জেনারেটরের আদিরূপ বলা যেতে পারে। যদিও জেনারেটরের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।

তড়িৎ এবং চুম্বকত্বের মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে স্থির বৈদ্যুতিক নীতির ওপর ভিত্তি করেই জেনারেটর নির্মিত হত। ব্রিটিশ উদ্ভাবক জেমস উইমহার্স্ট এমন একটি স্থির বৈদ্যুতিক যন্ত্র তৈরি করেছিলেন, যার নাম উইমহার্স্ট যন্ত্র।

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে স্যার হামফ্রে ডেভির ল্যাবে কাজ করার সময় ফ্যারাডে লক্ষ করেন, একটা তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে চুম্বককে আনা-নেওয়া করলে ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়।

এই আবিষ্কারকে ফ্যারাডের তড়িচ্চুম্বকীয় নীতি বলা হয়। এই নীতির ওপর ভিত্তি করে ফ্যারাডেই প্রথম তড়িচ্চুম্বকীয় জেনারেটর তৈরি করেন, যা তড়িৎ উৎপাদন করতে সক্ষম।

অ ক্টো ব র ক থা

২৫ অক্টোবর ১৯১৭ সালে দুনিয়াকে চমকে দেওয়ার মতো একটি ঘটনা ঘটে, এককথায় যাকে বলা হয় অক্টোবর বিপ্লব। পৃথিবীর ইতিহাসে অক্টোবর বিপ্লব এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই বিপ্লবটি ছিল এক নতুন দর্শনের সূচনা। যুগে যুগে বঞ্চিত, শোষিত শ্রমিক শ্রেণির পুঞ্জীভূত ক্ষোভের উত্থান সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে, প্রতিটি মানুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখায় এই অক্টোবর বা বলশেভিক বিপ্লব।

বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। এই অক্টোবর বিপ্লব ছিল মূলত রুশ বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপ। প্রথম ধাপটি, ইতিহাসে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব নামে পরিচিত। এই বিপ্লবটি মূলত ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসের ৭ তারিখে সংঘটিত হলেও তৎকালীন রুশ জুলিয়ান ক্যালেন্ডার প্রচলিত থাকার কারণে বিপ্লবের সময়কাল হয় অক্টোবরের ২৫ তারিখ।

এই বিপ্লবের পিছনে অনেকগুলো কারণ চিহ্নিত করা যায়: প্রথম কারণ হিসেবে ধরা যায়, রাশিয়ার সামগ্রিক অর্থনীতির বেহাল দশা। ১৯১৭ সালের দিকে রাশিয়ার মোট উৎপাদন প্রায় ৩৫-৪০ শতাংশ কমে যায়। দেশে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি। ১৯১৩ সালের তুলনায় ১৯১৭ সালে এসে শ্রমিকদের বেতন প্রায় ৫০ শতাংশ কমে যায়। রাশিয়ার মোট দেনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৫০ বিলিয়ন রুবল। শ্রমিক এবং কৃষকদের দৈন্য চরম অবস্থায় পৌঁছোয়, অধিকাংশ প্রান্তিক কৃষক ভূমির মালিকদের দ্বারা নির্যাতিত হন। সর্বোপরি, মেহনতি মানুষের মুক্তির আহ্বান নিয়ে তৎকালীন ইউরোপে এক নতুন দর্শন জাগরণের সৃষ্টি করেছিল, যার নাম ছিল মার্কসবাদ।

১০ অক্টোবর লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিকদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ২৩ অক্টোবর বলশেভিক নেতা জ্যান আনভেল্টের নেতৃত্বে বামপন্থী বিপ্লবীরা এস্তোনিয়ার রাজধানীতে বিক্ষোভ শুরু করে। তার দু-দিন পরে ২৫ অক্টোবর লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবী রেড গার্ডস পেত্রোগার্দে (বর্তমান সেন্ট পিটার্সবার্গ) বিক্ষোভ শুরু করে। ঠিক ৯টা ৪৫ মিনিটে যুদ্ধজাহাজ অরোরা থেকে একটা ফাঁকা শেল নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তারা পেত্রোগার্দের গুরুত্বপূর্ণ অফিসগুলির দখল নিয়ে ফেলে এবং উইন্টার প্যালেসের দিকে (অস্থায়ী সরকারের প্রধান দফতর) অগ্রসর হয়। খুব কম সময়ে প্রাসাদের পতন হয়। বিপ্লবীদের জয় হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রমিকদের শাসন। প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতন্ত্র। এর পর

এগিয়ে যেতে থাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ক্রমেই হয়ে ওঠে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সর্বাংশে সফল কি না, তা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। কিন্তু এই বিপ্লব যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, সেই স্বপ্ন যতদিন মেহনতি মানুষের সংগ্রাম থাকবে, ততদিন বেঁচে থাকবে তাদের মস্তিষ্কে।

ন ভে ম্ব র ক থা

৩ নভেম্বর মানুষের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৫৭ সালের ওই দিনটিতে স্পুটনিক-২ নামের একটি কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি জীবন্ত প্রাণীকে মহাকাশভ্রমণে পাঠিয়ে ইতিহাস রচনা করে। পৃথিবীর চারপাশের কক্ষপথে ভ্রমণকারী সেই প্রথম প্রাণী ছিল একটি কুকুর, যার নাম— লাইকা। লাইকার সঙ্গে আরও দুটি কুকুরকে এই মহা-অভিযানের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত লাইকাই নির্বাচিত হয়।

লাইকার মূল নাম 'কুদরিজাভকা' এবং সে ছিল একটি মেয়েকুকুর। রাশিয়ার পাঠানো কুকুরটি ১৯৫৭ সালে স্পুটনিক-২ মহাকাশযানে মহাশূন্যে যায়। অবশ্য এ-যাত্রাই ছিল তার শেষ যাত্রা, কেননা, তখনো মহাকাশ থেকে ফিরে আসার প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়নি। এর আগে

কোনো জীবিত প্রাণী মহাকাশভ্রমণে যায়নি। অবশ্য রকেট উৎক্ষেপণের পর অত্যধিক চাপ এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লাইকা মারা যায়। তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোনো সমস্যার কারণে এমনটি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এই অভিযানের কয়েক দশক পর লাইকার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ মানুষকে জানানো হয়। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক যেসব কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করা হয়, সেগুলো স্পুটনিক নামে পরিচিত। পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডল নিয়ে গবেষণা চালানো, মহাকাশযাত্রায় প্রাণীর দেহে কী প্রভাব ফেলে এবং সোভিয়েত রকেট প্রযুক্তি পরীক্ষা করে দেখাই ছিল স্পুটনিক কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। স্পুটনিক-২-এর জন্য তিনটি কুকুরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, যাদের নাম আলবিনা, মুশকা এবং লাইকা। রুশ মহাকাশ-জীববিজ্ঞানীরা লাইকাকে নির্বাচন করেন এবং তাকে প্রশিক্ষণ দেন। নভোযানটিতে জীবনধারণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এতে একটি অক্সিজেন উৎপাদক এবং অক্সিজেনকে বিষাক্ত হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছিল। একটি পাখা ছিল, যা কেবিনের তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে বেড়ে গেলেই সক্রিয় হয়ে উঠত এবং কুকুরের সহনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখত। ৭ দিন বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাবার জেলাটিন হিসেবে সরবরাহ করা হয়েছিল। উঠে দাঁড়ানো, হাঁটা বা শোয়ার জন্য লাইকা যেন বেশি নড়াচড়া করতে না পারে, এ-জন্য শিকল ছিল। কেবিনটিতে উলটো দিকে ঘোরার মতো যথেষ্ট জায়গা ছিল না। তাই কুকুরকে ঘোড়ার সাজের মতো একটি হার্নেস পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হৃদ্‌যন্ত্রের পালস নির্ণয়ের জন্য একটি ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাম ছিল। এ ছাড়া শ্বসন হার, সর্বোচ্চ ধমনী-চাপ এবং কুকুরের চলাচল শনাক্ত করার উপযোগী যন্ত্রপাতিও ছিল। ২০০৮ সালের ১১ এপ্রিল রুশ কর্মকর্তারা লাইকার সম্মানে একটি স্মৃতিসৌধ স্থাপন করে। মস্কোর একটি সামরিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাছে এই ছোট্ট স্মৃতিসৌধটি অবস্থিত। স্পুটনিক-২-এর ওজন ছিল ৫০৮ কিলোগ্রাম। ১৯৬০ সালের ১৯ অগাস্ট স্পুটনিক-৫ বহন করে বেলকা আর স্ট্রেলকা নামের দুটি কুকুরকে। এটিই প্রথম যান, যাতে কোনো প্রাণী কক্ষপথে ভ্রমণ শেষে জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরে আসে।

ডি সে ম্ব র ক থা

১৯০১ সালের ৩ ডিসেম্বর জন্ম ওয়াল্টার এলিয়াস ডিজনির, যিনি দুনিয়া জুড়ে ওয়াল্ট ডিজনি নামে বিখ্যাত। ডিজনি ছিলেন পৃথিবীর প্রথম অ্যানিমেশন প্রোগ্রামার এবং বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী আর সফল প্রযুক্তি-ভাবনার অধিকারী। একজন মার্কিন চলচ্চিত্র প্রযোজক, নির্দেশক, কাহিনিকার, নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী ও অ্যানিমেটর।

শিকাগো শহরে জন্ম। তিনি তাঁর পিতা এলিয়াস ডিজনি ও মাতা ফ্লোরার চতুর্থ সন্তান। পিতা এলিয়াসের জন্ম কানাডা প্রদেশে। ছিলেন আইরিশ বংশোদ্ভূত। ডিজনির মা জার্মান ও ইংরেজ বংশোদ্ভূত মার্কিন।

ওয়াল্ট ডিজনির অন্য ভাইয়েরা হলেন হারবার্ট, রেমন্ড, রয় এবং তাঁর ছোটোবোন রুথ। ১৯০৬ সালে যখন ডিজনির বয়স চার, তাঁর পরিবার মিসৌরির মার্সেলিনে একটি খামারে চলে যান। সেখানে তাঁর কাকা রবার্ট অল্প কিছুদিন পূর্বে একটি জমি কিনেছিলেন। ছোটোবেলা থেকে ছবি আঁকার প্রতি অনুরাগ ছিল। মার্সেলিনে এক অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তারের ঘোড়ার ছবি আঁকার জন্য পারিশ্রমিক পাওয়ার পর ডিজনির অঙ্কনে আগ্রহ বেড়ে যায়। বাবা এলিয়াস সংবাদপত্রের গ্রাহক ছিলেন এবং ডিজনি প্রথম পাতায় রায়ান ওয়াকারের আঁকা কার্টুনের প্রতিলিপি আঁকতেন। ডিজনি জলরং ও ক্রেয়ন দিয়েও আঁকার দক্ষতা অর্জন করেন।

বালকবয়স থেকেই তিনি ছবি আঁকা শেখাতেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি ইলাস্ট্রেটর হিসেবে চাকরিতে ঢোকেন। ১৯২০ সালে হলিউডে গমন করেন এবং তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে রয় স্টুডিয়ো নামে একটি প্রযোজনা সংস্থা গড়ে তোলেন। ছোটোদের জন্য তাঁর ভাবনা ছিল বিচিত্র। ১৯২৮ সালে ডিজনি তাঁর বিখ্যাত চরিত্র মিকি মাউস সৃষ্টি

করেন। কার্টুন ফিল্মের জনক ওয়াল্ট ডিজনি প্রথমদিকে নিজেই মিকি মাউস চরিত্রে কণ্ঠস্বর দিতেন। ১৯৫০ সালে তিনি তাঁর বিনোদন পার্ক সম্প্রসারণ করেন। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বিখ্যাত ডিজনিল্যান্ড, যেটি এখন ক্যালিফোর্নিয়ার অবশ্যদ্রষ্টব্য। আমেরিকার এবং সারাপৃথিবীর সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কার অ্যাকাডেমি পান পঁচিশ বার। ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর ওয়াল্ট ডিজনির মৃত্যু হয়। ■

Al-Ameen Mission
34
years in service to the society

রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স ইঞ্জিনিয়ারিং ২০১৯-এর কৃতীদের হার্দিক অভিনন্দন

৫০০০-এর মধ্যে **৬২** | ৭৫০০-র মধ্যে **১২৫** | ১০০০০-এর মধ্যে **১৭৬** | ১২৫০০-এর মধ্যে **২১৮** | ১৫০০০-এর মধ্যে **২৫৩**

আবু হাসান গাজি
র‍্যাঙ্ক ৩৯৩

সাইফ রাজ
র‍্যাঙ্ক ৪০২

মুইন নাসিফ
র‍্যাঙ্ক ৪০৩

মাকসেদুল রহমান
র‍্যাঙ্ক ৪৫৬

মহ. রুমানুজ্জামান
র‍্যাঙ্ক ৫৫৩

সালমান সেখ
র‍্যাঙ্ক ৫৯২

উমর ফারুক
র‍্যাঙ্ক ৬৪২

হাসানুর ইসলাম
র‍্যাঙ্ক ৭৬৫

সাদ্দাম মণ্ডল
র‍্যাঙ্ক ৮৬৫

আসাফ আলি
র‍্যাঙ্ক ১৫৯৩

মহ. আসফাকুল
র‍্যাঙ্ক ১৬৭৭

রাজ সেখ
র‍্যাঙ্ক ১৭২৬

মিজানুর রহমান
র‍্যাঙ্ক ১৭৬৪

মোবাস্সের আলম
র‍্যাঙ্ক ২০১৬

ইকবাল হাবিব
র‍্যাঙ্ক ২০৫৭

মহ. জাহিরুদ্দিন
র‍্যাঙ্ক ২০৮২

আলামিন ইসলাম
র‍্যাঙ্ক ২২৫৮

সাঈম আলম
র‍্যাঙ্ক ২২৬২

আসিফ ইকবাল
র‍্যাঙ্ক ২২৭৪

ইমতাজুল হক
র‍্যাঙ্ক ২২৯৬

মতিবুর রহমান
র‍্যাঙ্ক ২৪০৪

মহ. মিলন
র‍্যাঙ্ক ২৫৩৬

আবু সাহিন
র‍্যাঙ্ক ২৫৪১

আতিক বিক্রম
র‍্যাঙ্ক ২৫৮২

মহ. রাশমাম
র‍্যাঙ্ক ২৬৯৯

সাজিদ মহাম্মাদ
র‍্যাঙ্ক ২৭৩৭

সেখ রাহুল আমিন
র‍্যাঙ্ক ২৭৭২

জাহিদ আখতার
র‍্যাঙ্ক ২৯১০

মহ. আব্দুল আজিজ
র‍্যাঙ্ক ২৯১১

মিজান আলি
র‍্যাঙ্ক ৩০৪৩

আব্দুল আজিজ
র‍্যাঙ্ক ৩১৪০

সাবির মণ্ডল
র‍্যাঙ্ক ৩২০৯

নূরনবি হক
র‍্যাঙ্ক ৩২৫৪

আলি রিয়াজ
র‍্যাঙ্ক ৩৩৩৪

সাহানুর আলম
র‍্যাঙ্ক ৩৪৩৮

রাজু সেখ
র‍্যাঙ্ক ৩৫১১

নাবিল জাহান
র‍্যাঙ্ক ৩৫৫১

আসিক ইকবাল
র‍্যাঙ্ক ৩৫৮৮

OUTSTANDING PERFORMANCE IN NEET (UG) 2019

(All Medical Ranks are in General Category)

61	146	243	372	422
within 15000	within 25000	within 35000	within 50000	within 55000

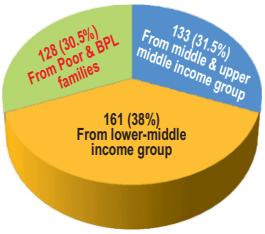

Boys 360 | Girls 62

DISTRICT-WISE SUCCESS

Murshidabad	105
Malda	80
S 24 Parganas	54
Birbhum	34
Nadia	30
N 24 Parganas	20
Burdwan	17
Uttar Dinajpur	15
Midnapore	15
Hooghly	14
Howrah	10
Dakshin Dinajpur	9
Kolkata	7
Others	12
Total	422

AIR 1883
SAMSUL MALLITYA

AIR 2068
MD IBRAHIM

AIR 2753
HUMAUN LASKAR

AIR 3456
SIRAJ KABIR

AIR 3854
MAMUN AKTAR

AIR 4351
RAKIB SK

AIR 4511
ROBIN SAIKH

AIR 4528
TAUHIDA NASRIN

AIR 5156
SK JAMILUDDIN

AIR 5283
SOHEL ARMAN

AIR 5505
IMAMUL HAQUE

AIR 5515
TAUSIF ALI

AIR 5668
SANOWAR HOSSAIN

AIR 5847
ASIF IQBAL MOLLA

AIR 5851
ZAKIR HUSSAIN

AIR 5916
KAZI ABDUL MASUD

AIR 6363
SAHIL LASKAR

AIR 6381
SK KALIMUDDIN

AIR 6437
SARIFUL ISLAM

AIR 7076
ASHIK UR RAHMAN

AIR 7246
SAMIM AKTAR

AIR 7467
SAHABUDDIN SAIKH

AIR 7763
NADIS AFRAJ

AIR 7787
SOHEL RANA

AIR 7870
MD ARIF BILLAH

AIR 8472
ASMAUL HOSSAIN

AIR 8545
ATIQUE BIKRAM

AIR 8987
JARMAN SEIKH

AIR 9666
SOHEL RANA

AIR 9905
MANOWAR HOSSAIN

AIR 10136
JARJIS AHAMED

AIR 10318
PARVEJ SAMIM

AIR 10779
AMENA KHATUN

AIR 10829
MANOYAR HOSSAIN

AIR 10936
ABDUL MONTAKIM

AIR 11533
ASHIK HABIBULLAH

AIR 11781
SAHIL ALAM

AIR 11803
TUHINA PARVIN

AIR 11847
HANIF MOHAMMAD

AIR 11867
NOURIN ALAM

AIR 11999
MD MIRAJ ALI

AIR 12044
TOUSIN MONDAL

AIR 12104
NAWAJ SHARIF

AIR 12523
SULTAN MAMUD